প্রচ্ছদঃ পুণ্ডরীক গুপ্ত

সাহিত্যসমুদ্রে ডিঙি একখানা বেছে নিয়ে শেষমেশ ভেসেই পড়লাম। মনের আঙিনায় আমার বীজ বপন হয়েছিল আজ থেকে বছর তিনেক আগে। পূর্ণাঙ্গ একটা পত্রিকা হিসেবে একপর্ণিকা আত্মপ্রকাশ করব, এই স্বপ্নই ছিল চোখে। কিন্তু কিছু বাধা-বাধ্যকতা আর কিছু কারণ-অকারণ মিলিয়ে তখনকার মতো আমার ভূমিষ্ঠ হওয়াটা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। সবদিক দিয়ে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও একপর্ণিকার বীজটি কিন্তু স্বস্থানে সযত্নে লালিত হচ্ছিল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস - বিন্দুমাত্র উর্বরতা না হারিয়ে। শেষপর্যন্ত সাহিত্য-আঙিনায় আজই প্রথম পাতা মেলে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলাম।

ছোট্ট ছোট্ট হাতে এখনকার মতো খুব বেশি মণিমুক্তো কুড়োতে না পারলেও পাঠকবন্ধু আর লেখকবন্ধুদের সমাদর পেলে একপর্ণিকা একদিন ডিঙি থেকে মণিমুক্তো বোঝাই জাহাজরূপে সাহিত্যসমুদ্রে ভেসে বেড়াবে এই আকাঙ্ক্ষাই রইল।

একপর্ণিকা

শুভেচ্ছা বার্তা

কে কী দিবি জন্মদিনে
অনেক কিছু আনবি কিনে?
মোটরগাড়ি, পুতুলবাড়ি
খেলনা রকেট, হাউই চিনে?
তার বদলে কলম ধরে
দু'চোখভরা স্বপ্ন আলো,
একটা গল্প ফেল না গড়ে
একটা কমিকস দারুণ ভালো।
পড়ুক ঝরে সেই লেখারা
সামনে খোলা যন্ত্রখাতায়,
ছোট্টো স্বজন একপর্ণিকা
সাজিয়ে নিক নিজের পাতায়।

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

শুভেচ্ছা বার্তা

বাক্স ভরা
গল্প ছড়া,
আনছে কারা?
একটু দাঁড়া।
এই দেখ না,
শব্দে বোনা
শেতলপাটি
বেজায় খাঁটি।

সঙ্গে আছে
গল্প গাছে
আস্ত গরু
এই তো শুরু।
দিচ্ছে পাড়ি,
মজার গাড়ি।
পাখপাখালি,
মজন্তালি।
যে খুশি আয়,
ইচ্ছেডানায়।
ধুমধামাকায়,
একপর্ণিকার এই দুনিয়ায়।

মধুমিতা ভট্টাচার্য

~ সূচিপত্র ~

কচিপাতা

গল্প

সেই বাঁশি - ঋত্বিক প্রিয়দর্শী
ডাইনোসরের খোঁজে - রজতাভ রুদ্র

আঁকিবুঁকি

অনুষ্কা মণ্ডল
প্রত্যক চক্রবর্তী
রজতাভ রুদ্র
অহনা শ
সৃজিত সরকার

গল্প

সাহেবি স্কুলের ভূত - বাবিন
আনন্দময়ী হোম - মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী
শব্দ - রুচিস্মিতা ঘোষ
অনেক কিছু পাওয়া - কিশোর ঘোষাল
কুতুয়া - প্রকল্প ভট্টাচার্য
সাবধানে যাবেন - সৈকতা দাস

কমিকস

ভেন্ট্রিলোকুইস্ট - বিনয় পাল

আসলি মজা - মধুমিতা ভট্টাচার্য
ডানা মেলা ভোর - শুভ্রা ভট্টাচার্য
ইচ্ছেখুশির ইচ্ছে - নুরজামান শাহ্
মেনিয়া - উত্তীয় কোলে

চড়িদার মুখোশ, ঝরনা আর পাখিপাহাড় - বাবিন

রক্তবৃষ্টি - দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

আজব রীতি রেওয়াজ - কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কী আশ্চর্য!

———

- এই সংখ্যায় আমরা যারা রয়েছি -

	অহনা শঃ বর্ধমানের বাসিন্দা এই বন্ধু বর্ধমান মডেল স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। ভালো লাগে ব্যাডমিন্টন আর নাচ। অবসর সময়ে ছবি আঁকতে, গ্লাস পেন্টিং করতেও খুব উৎসাহী।
	অনুষ্কা মন্ডলঃ এই খুদে বন্ধুর বাড়ি বর্ধমানে। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল গার্লস স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। শখ গান, নাচ আর ছবি আঁকা। বড়ো হয়ে ইনি ডাক্তার হতে চান।
	রজতাভ রুদ্রঃ ত্রিপুরার কাকড়াবনস্থিত 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন'-এর চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। পড়াশুনো শেষে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে হঠাৎই রাত বারোটা সাড়ে বারোটায় উঠে রং-তুলি নিয়ে বসে যান মাঝেমধ্যে। কখনও বা লিখে ফেলেন একটা গল্প বা ছড়া। আঁকাআঁকির পাশাপাশি লেখালিখিতেও সমান উৎসাহ তার।
	ঋত্বিক প্রিয়দর্শীঃ এই খুদে বন্ধু কলকাতার এপিজে স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়েন। লেখালিখির পাশাপাশি ভালোবাসেন ছবি আঁকতে আর বাঁশি বাজাতে। ২০১১ সালে 'জয়ঢাক' পত্রিকায় প্রথম লেখার প্রকাশ।
	কিশোর ঘোষালঃ পেশায় বাস্তুবিদ, ভারতের আনাচে কানাচে নির্মাণের কাজে ঘুরে বেড়িয়েছেন দীর্ঘদিন। সংগ্রহ করেছেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ইদানীং লেখালেখির জগতেও পা রেখেছেন। নিয়মিত লিখছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, ই-ম্যাগাজিনে। তাঁর তিনখানি বই, 'বিনি সুতোর মালা', 'চিরসখা হে' আর কিশোরদের জন্যে 'তিন এক্কে তিন হেমকান্ত মীন' পাঠকমহলে সমাদর পাচ্ছে।
	দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যঃ ১৯৯৫ সালে গৌহাটির 'সময় প্রবাহ' পত্রিকায় লেখালিখি শুরু হয়ে আজ বিশেষত বাংলা শিশুকিশোর সাহিত্যের দুনিয়ায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ২০০০ সালে জন্ম দিয়েছিলেন 'জয়ঢাক' নামে জনপ্রিয় এক শিশুকিশোর পত্রিকার। আজ অবধি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সম্পাদনা করে আসছেন।
	বাবিনঃ রবীন্দ্রভারতী থেকে স্নাতক। কলেজে পড়ার সময় একুশ বছর বয়সে লেখালিখির শুরু। কিশোর ভারতী, সন্দেশ, প্রতিদিন, রাজপথ, কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান সহ বেশ কয়েকটি কিশোর পত্রিকাতে লেখালিখি। পরবর্তীকালে কাজের সূত্রে দিল্লিতে প্রবাস যাপন। তারপর পুনে, মুম্বই, পাটনা ঘুরে ফের কলকাতা ফিরে আসা। বর্তমানে একটি সর্বভারতীয় প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। সফটওয়্যারসংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত। দীর্ঘ পনেরো বছর পর আবার অল্প কিছুদিন হল ফের লেখালিখির শুরু।

	সুজাতা চ্যাটার্জীঃ ছোটোবেলা কেটেছে এলাহাবাদে। তারপর কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ ও বেথুন কলেজে গণিত নিয়ে B.Sc ও M.Sc। পেশায় গণিতশিক্ষিকা হলেও, অঙ্ক করার সাথে সাথে ভীষণরকম ভালো লাগে নাচ, গান, ছবি আঁকা, কবিতা লেখা ও নানাধরনের হাতের কাজ করতে। বর্তমানে স্বামীর কর্মসূত্রে ব্রাসেলস, বেলজিয়ামের বাসিন্দা এবং নিজের ছোট্ট মেয়ের সাথে শৈশবটাকে নতুন করে খুঁজে নিতে ব্যস্ত।
	সৈকতা দাশঃ কলেজপড়ুয়া এই বিজ্ঞানের ছাত্রীর বাড়ি হাওড়া জেলায় হলেও বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুরের অস্থায়ী বাসিন্দা। ভীষণ ভালোবাসেন গল্পের বই পড়তে। লেখালিখি পুরোটা শখ নয়, এটা তাকে ভালো থাকতে শেখায়। ক্লাস নাইন টেনে পড়ার সময়ই লেখালিখির হাতেখড়ি।
	মৈত্রেয়ী চক্রবর্তীঃ শ্রীমতী থাঙ্কমণি কুট্টির কাছে নাচের, শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রর কাছে গানের আর শিহান শিবাজী গাঙ্গুলীর কাছে ক্যারাটের তালিমের পর এখন তার প্রবাস-জীবন পুরোপুরি স্বামী-কন্যাসহ সংসারে নিমগ্ন নিজের মনে টুকটাক লেখালেখি করলেও ২০১৩ সালে ক্যান্সারের যন্ত্রণা ভুলতে হাতিয়ার করেন লেখাকে। বর্তমানে বহু বাংলা ব্লগ, ই-ম্যাগাজিন, ব্লগজিনে সুপরিচিত নাম। ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনে স্নাতকোত্তর মৈত্রেয়ী রান্নার পাশাপাশি ফটো তোলা ও সময় পেলেই বেড়াতে ভালোবাসে।
	মানস পালঃ এই তরুণ অঙ্কনশিল্পী ছোটবেলায় আঁকার স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন মামার উৎসাহে। নানাবিধ এগজিবিশন দেখার মধ্য দিয়ে মনের মধ্যে জন্মায় আঁকার প্রতি প্রবল আকর্ষণ। তারপর প্রথমে 'প্রাচীন কলাকেন্দ্র' ও পরে 'বিড়লা অ্যাকাডেমি'তে চলে ডিজিটাল পেন্টিংয়ের ওপর প্রশিক্ষণ। বর্তমানে ছবি সম্পাদনা এবং এর সঙ্গে যুক্ত অপরাপর কাজে ব্যস্ত।
	রুচিস্মিতা ঘোষঃ জন্ম রাঁচিতে। বর্তমানে কলকাতায় থাকেন। রসায়নশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। বহুদিন ধরে বড়োদের এবং ছোটোদের জন্য লেখালিখি করছেন। প্রকাশিত হয়েছে অনেকগুলো বই। দুটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন।
	শুভ্রা ভট্টাচার্যঃ কম্পিউটারে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী এই লেখিকা পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটিবাসী। শিশু, পশুপাখি, প্রকৃতি প্রভৃতিকে নিয়ে লিখতে ভালোবাসেন।
	কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বিজ্ঞানের উপাসক বর্ষীয়ান জনপ্রিয় এই প্রবন্ধকার এবং শিক্ষাবিদ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। 'দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি', 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ', 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' এবং 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার'-এর আজীবন সদস্য। 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' এবং 'বালিগঞ্জ ইন্সটিটিউট'-এর সহ-সভাপতি। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে বিজ্ঞানের অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকেন। 'দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল' শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২০০৫ সালে 'গোপাল ভট্টাচার্য স্মৃতি' পুরস্কার প্রদান করেন।
	নুরজামান শাহঃ জন্ম ১লা মার্চ, ১৯৯৬। বাসস্থান হুদা হেরামপুর, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ। বহরমপুর কলেজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স, তৃতীয় বর্ষে পাঠরত। লেখালেখি ২০১০ সাল থেকে। মূলত ছড়া বা কবিতা লিখলেও গল্প, নিবন্ধও লিখে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বাংলাদেশের দৈনিক কাগজসহ কিশোর ভারতী, রঙবেরঙ, শিশুমেলা, টগবগ, শিশুসাহিত্য আকাদেমি পত্রিকা, ম্যাজিক ল্যাম্প প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদিত পত্রিকা, 'নবপল্লব'।

	বিনয় পালঃ বিজ্ঞানে স্নাতক এই শিল্পী অ্যানিমেশনের দুনিয়ায় নিজের পেশাকে খুঁজে নিয়েছেন। বাড়তি শখগুলো হচ্ছে, বই পড়া, কমিকস তৈরি করা। কল্পবিজ্ঞান, ভৌতিক, থ্রিলার আর অ্যাডভেঞ্চারের ভীষণ ভক্ত।
	প্রকল্প ভট্টাচার্যঃ দীর্ঘদিন চেন্নাই প্রবাসী। পেশায় একটি বহুজাতিক মার্কেট রিসার্চ কোম্পানির এডিটিং ম্যানেজার। বাংলা-ইংরাজী-হিন্দী-তামিল অনুবাদের কাজও করেন। লেখেন মূলত বাংলায় কবিতা ও রম্যরচনা। তবে শিশুসাহিত্যে আগ্রহ সবথেকে বেশি।
	উত্তীয় কোলেঃ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমাননিবাসী এই ছড়াকার কম্পিউটারে স্নাতকোত্তর। ভালোবাসেন ছড়া আর কবিতা লিখতে।
	প্রত্যক চক্রবর্তীঃ ক্যারাটেতে অরেঞ্জ বেল্টধারী, কলকাতার বারুইপুরনিবাসী এই খুদে বন্ধু 'ওয়েলকিন ন্যাশনাল স্কুল'-এ চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েন। ছবি আঁকা, গল্প লেখা আর নানাধরনের কার্ড কালেকশনে তার দারুণ উৎসাহ। ও হ্যাঁ, মাঝেসাঝে অভিনয়ও করে থাকেন।
	সৃজিত সরকারঃ এই খুদে বন্ধু বারুইপুরনিবাসী। পড়েন 'ওয়েলকিন ন্যাশনাল স্কুল'-এ চতুর্থ শ্রেণীতে। ছবি আঁকার পাশাপাশি ক্যারাটে ও নানারকম হস্তশিল্প তৈরিতে সমান উৎসাহী এই শিল্পী।

	মধুমিতা ভট্টাচার্যঃ জন্ম আসানসোলে। স্কুলের পড়া ওখানেই সাঙ্গ করে শান্তিনিকেতন যাত্রা। তারপর সেখানে প্রায় বারো বছর বাস। স্নাতক, স্নাতকোত্তর আর পিএচডি শেষ হয় ওখানেই। তারপর স্বামীর কর্মসূত্রে আসাম ও বর্তমানে ডুয়ার্সের চা-বাগানে বাস। এর মাঝে লেখালিখি, স্কুলে শিক্ষকতা ও প্রিন্সিপ্যালের পদ সামলেছেন। গল্প, কবিতা, ছড়া, নিবন্ধ, রম্যরচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। লেখা ছাড়াও গান, ছবি আঁকা ও আরও নানান কাজে ব্যস্ত রাখেন নিজেকে।

আর আমি

	রাজীবকুমার সাহাঃ সবার স্নেহ-ভালোবাসাগুলোকে এক ডালিতে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করার দায়িত্বে।

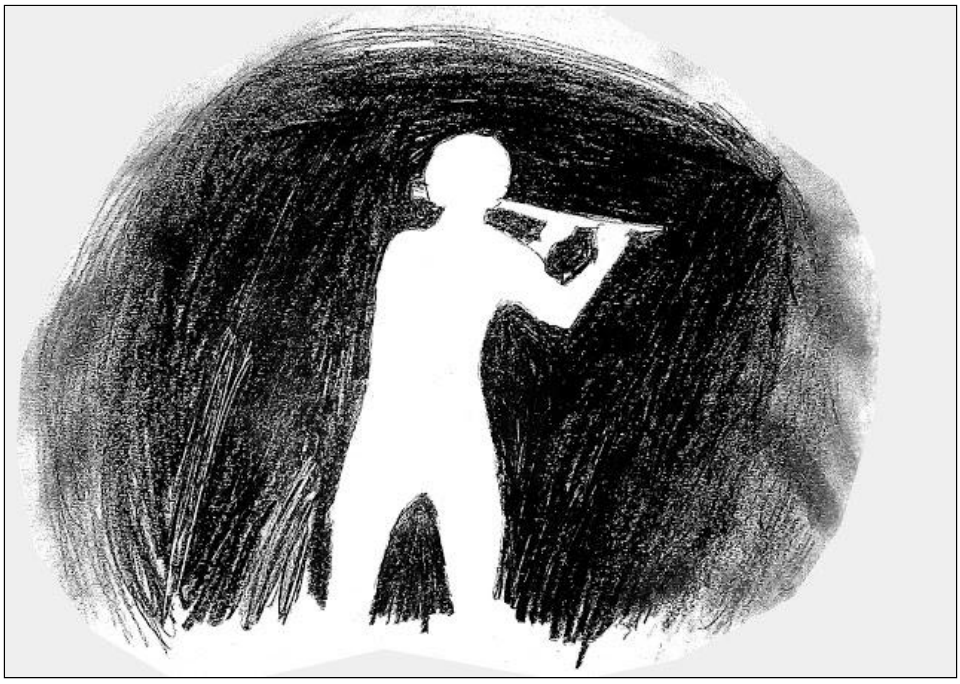

সেই বাঁশি

ঋত্বিক প্রিয়দর্শী

"হ্যাঁ, এখন শিলিগুড়িতে। কালকে সকালবেলায় আলিপুরদুয়ারে পৌঁছব," বলে ফোনটা কেটে দিলাম।
আমি একজন সাধারণ উকিল। এবার যাচ্ছি আলিপুরদুয়ারে একটা জরুরি কেসে। ভেবেছিলাম, কেসটা মিটলে তিনদিন লেপচাখা বলে একটা গ্রামে ঢুঁ মেরে আসব।

তিনদিন পর...
"ট্যাক্সি!" বলে ডাকলাম একটা ট্যাক্সিকে।
লোকটা বলল, "কহা যানা হ্যায়?"
"সদরবাড়ি।"
"তিন সৌ রুপেয়," লোকটা জবাব দিল।
"তিনশো টাকা!" মনে মনে ভাবলাম, 'পাঁচবছর আগেই তো গেছিলাম সদরবাড়ি আশি টাকায়!'
"সৌ দুঙ্গা বস," বলতেই গাড়িটা এগোতে লাগল। "দেড় সৌ নহি দো সৌ দুং..." বলতে বলতে গাড়িটা বেরিয়ে গেল।
শেষপর্যন্ত একটা অটো ধরে যেতে হল সদরবাড়ি। জায়গাটা বেশ ভালো মনে হল। পরেরদিন সকালবেলায় এককাপ চা খাওয়ার পর পিঠে ব্যাগটা তুলে বেরোলাম লেপচাখা যাওয়ার পথে। রাস্তায় যখন উঠছিলাম তখন মনে হল যে ব্যাগে দুই প্যাকেট ক্রিম বিস্কুট নেওয়া উচিত ছিল।
মেঘগুলো হঠাৎ ডেকে উঠল। আমায় সঙ্কেত দিছিল যে একটু পরে বৃষ্টি নামবে। ব্যাগ থেকে বের করে রেনকোটটা গায়ে দিলাম। লেপচাখায় পৌঁছতে লাগল তিনঘন্টা। কিন্তু পৌঁছানোর পর বুঝতে পারলাম যে না, হাঁটাটা সার্থক হয়েছে।
জামাকাপড় ছেড়ে বেরোলাম যখন, তখন সূর্যাস্ত হবে হবে করছে। সামনের বেঞ্চে পাদুটো ছড়িয়ে বসে পাহাড়ের দিকে তাকালাম। সূর্যটা অস্ত যাচ্ছে। আকাশটা হলদে কমলা থেকে আস্তে আস্তে গাঢ় নীল হয়ে উঠেছে। বাতাসে একটা ঘুম ঘুম ভাব চলে এসেছে।
বাইরের সোলার ল্যাম্প-পোস্টটা হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল। বেশি আলো নেই। টিমটিম করে আলোটা জ্বলছে। আমি ঘরে গেলাম।

ল্যাপটপের ঘড়িতে দেখি এগারোটা বাজে। ল্যাপটপটা বন্ধ করে যেই কম্বলটা গায়ে দিয়েছি, শুনলাম এক মধুর বাঁশির আওয়াজ। মনে হল যে এত সুন্দর বাঁশির সুর জীবনে আমি শুনিনি। মনটা কেমন জড়িয়ে উঠল। মনে হল, দরজাটা এক্ষুনি খুলে বেরিয়ে যাই আমি। ওই বাঁশির সুরের উৎসের কাছে আমি ছুটে যাই।

পরেরদিন রাত্তিরেও ওই আওয়াজটা শুনেছিলাম আমি। কাউকে আর জিজ্ঞেস করিনি।

পরের রাত...

আমার একটা খুব বাজে স্বভাব আছে ঘুমে হাঁটার। বুঝতে পারছিলাম যে আমি ঘর থেকে বেরিয়েছি। গায়ে শীত লাগছিল। হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখি যে আমি পাহাড়ের একটা অচেনা জায়গায়! পূর্ণিমার রাত, পুরো জঙ্গলটা যেন জেগে উঠেছে চাঁদের আলোয়। তখন আমি শুনতে পাই সেই মধুর বাঁশির শব্দ। দেখি একটা বাচ্চা ছেলে সাত-আট বছরের, মুখে একটা বাঁশি। গরু চরাচ্ছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কে, আর এখানে কী করছ?"

সে তার বাঁশি থেকে মুখ না ঘুরিয়ে একভাবে বাঁশি বাজাতে লাগল মুখে একটা হাসি নিয়ে। চোখ খুলে দেখি কয়েকজন গ্রামের লোক, "আপনি ঠিক আছেন?" আমাকে জিজ্ঞেস করছে।

তারপর যখন আমি লেপচাখা থেকে বেরবো তখন আমি ওদের জিজ্ঞেস করলাম যে কে ওই ছেলেটা?

ওরা বলল, "দশবছর আগে একটি রাখালছেলে ছিল। সে খুব সুন্দর বাঁশি বাজাত। একদিন ও গরু চরিয়ে বাড়ি ফিরছিল, তখন ও একটা ধ্বসে মারা পড়ে। সেইদিন থেকে রাত্তিরে ওর বাঁশির আওয়াজ সবাই শুনতে পায়।"

অলঙ্করণঃ ঋত্বিক প্রিয়দর্শী

কচিপাতাঃ গল্পঃ ডাইনোসরের খোঁজে - রজতাভ রুদ্র

ডাইনোসরের খোঁজে

রজতাভ রুদ্র

ভারতের পাঞ্জাবের একটি সুন্দর গ্রামে ছিল একটা সবুজ বাগান। সেই বাগানের পাশে একটা বড়ো দালান ঘর ছিল। সেই দালানে বাস করত তিনভাই ও তাদের মা-বাবা। সবথেকে ছোটভাইয়ের নাম ছিল রামু। মেজভাইয়ের নাম ছিল রতন ও সবথেকে বড়ভাইয়ের নাম ছিল রাখাল।

তারা তিনভাই তখনও ছোটো ছিল। রামুর ডাইনোসরের কমিকস পড়ার অনেক আগ্রহ ছিল। রতনের ডাইনোসরের ফসিল খোঁজার ভীষণ শখ ছিল আর রাখালের ডাইনোসরের ছবি আঁকার শখ ছিল।

দিন গেল, বছর গেল, রামু, রতন আর রাখাল বড়ো হল। তখন তারা সবসময় ডাইনোসরের ভিডিও গেম খেলত। তাদের স্বপ্নে সবসময় ডাইনোসর আসত। তখন তাদের মা-বাবা চিন্তা করল, তাদের মনে হয় সবসময় খারাপ স্বপ্ন আসে। কিন্তু তারা ভুল চিন্তা করছিল। তাদের সবসময় মজার স্বপ্ন আসত। তখন তারা বড়ো বড়ো ওঝা ডেকে পাঠাল। তখন তিনভাইয়ের মনে হল তারা তাদের মজার স্বপ্নকে মা-বাবার কাছ থেকে দূরে রাখবে। তখন তিনভাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে তারা বাড়ি থেকে পালিয়ে ডাইনোসরের খোঁজে লেগে পড়বে। তখন রামু, রতন আর রাখাল নিজের নিজের ডাইনোসরের কমিকস, ভিডিও গেম, ক্যামেরা ও সারা বিশ্বের ডাইনোসরের মানচিত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কিছু সময় পরে তাদের মা-বাবা এসে কান্নাকাটি করতে লাগল।

তার কিছুদিন পরে তারা রেলস্টেশনে গেল। তারা ট্রেনের টিকিট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারা প্রথমে ভারত থেকে শুরু করে অনেক জায়গায় ঘুরল। তারা অনেক ডাইনোসরের স্ট্যাচুর ছবি তুলেছিল। ডাইনোসরের মিউজিয়ামে গিয়ে অনেক জ্ঞান অর্জন করল ডাইনোসরের ব্যাপারে। তারা বিশ্বের সব জায়গায় ঘুরেছিল। কিন্তু আসল ডাইনোসরকে দেখেনি। তারা দুটি জায়গা ঘুরল না। সে দুটো জায়গা হল আফ্রিকার গভীর জঙ্গল ও জুরাসিক পার্ক।

তারা প্রথমে আফ্রিকায় গেল। অনেক পশুপাখিকে দেখল কিন্তু ডাইনোসরকে দেখল না। শেষে জুরাসিক পার্কে গিয়ে ডাইনোসরের দর্শন পেল। তারা অনেক ডাইনোসর দেখল যেমন, টি-রেক্স, ট্রাইসেরাটপস, স্টেগোসরাস ইত্যাদি আরও অনেক ডাইনোসরের খোঁজও করল, আবার অনেক ডাইনোসরের বন্ধুও হল। তারা একটা অসহায় ডিপ্লোডোকাসের বাচ্চাকে পালতে লাগল। তখন থেকে তাদের অনেক বই ছাপতে লাগল আর তখন থেকেই মানুষ ওদেরকে 'ডাইনোসর সন্ধানী' নামে জানতে লাগল।

তখন ভারতের পাঞ্জাবে ওদের মা-বাবারা মনে মনে ভাবল, আমরা তাদের স্বপ্ন থেকে দূরে সরাতে চেয়েছিলাম। যদি আমরা তাদের স্বপ্ন থেকে দূরে সরিয়ে দিতাম তাহলে তারা বিখ্যাত হতে পারত না।

অলঙ্করণঃ রজতাভ রুদ্র

কচিপাতাঃ আঁকিবুঁকিঃ অনুষ্কা মন্ডল

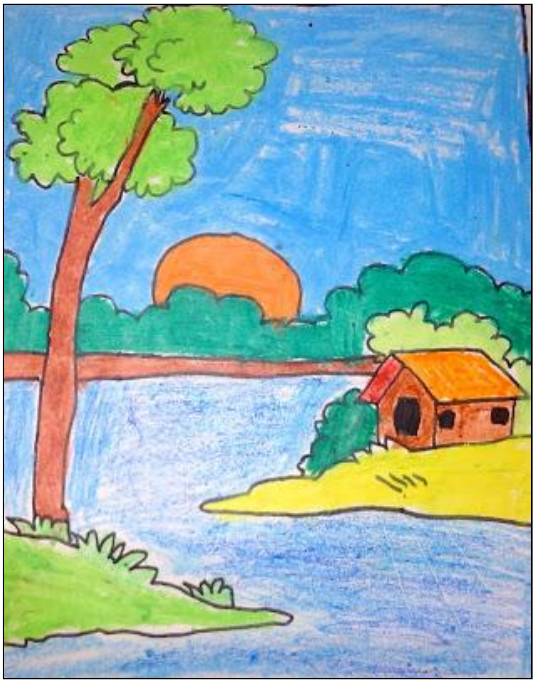

শিল্পীঃ অনুষ্কা মন্ডল

তৃতীয় শ্রেণী, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল গার্লস স্কুল

কচিপাতাঃ আঁকিবুঁকি

শিল্পীঃ প্রত্যক চক্রবর্তী

৪র্থ শ্রেণী, ওয়েলকিন ন্যাশনাল স্কুল

বারুইপুর, কলকাতা

শিল্পীঃ রজতাভ রুদ্র

৪র্থ শ্রেণী, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

কাকড়াবন, ত্রিপুরা

কচিপাতাঃ আঁকিবুঁকিঃ অহনা শ

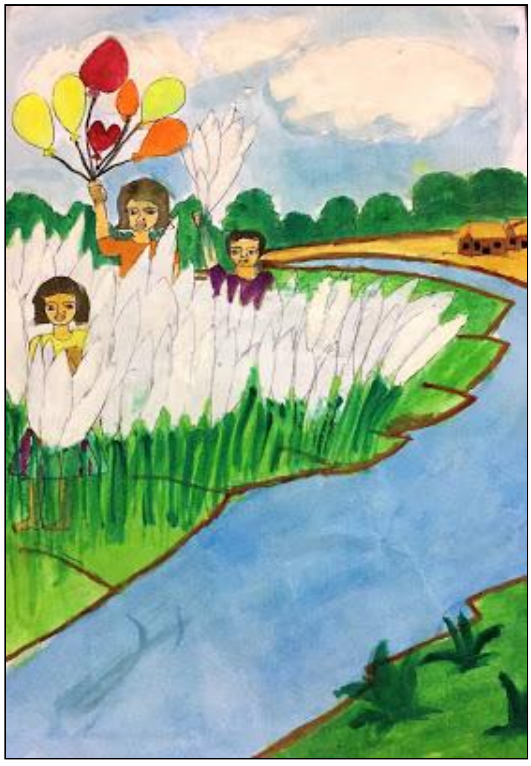

শিল্পীঃ অহনা শ

সপ্তম শ্রেণী, বর্ধমান মডেল স্কুল

কচিপাতাঃ আঁকিবুঁকিঃ সৃজিত সরকার

শিল্পীঃ সৃজিত সরকার

৪র্থ শ্রেণী, ওয়েলকিন ন্যাশনাল স্কুল

গল্পঃ সাহেবি স্কুলের ভূত - বাবিন

দূর থেকে স্কুলবাড়িটাকে দেখে কেন জানি আমার গা'টা ছমছম করতে লাগল। যদিও কোনও কারণ নেই তার।শুনেছিলাম, ভয় জিনিসটা এইরকমই ছোঁয়াচে। অথচ প্রথম যখন এই ছোট্ট পাহাড়ি শহরটার সেরা স্কুলে মেয়েকে ভর্তি করাতে গিয়েছিলাম, তখন কিন্তু গথিক স্থাপত্যে তৈরি এই বাড়িটা দেখে ভারি মুগ্ধ হয়েছিলাম। শুনেছিলাম, ইংরেজ আমলে তৈরি এই স্কুলটা। সাহেবরাই এই শৈলশহরটা তৈরি করেছিল। তাদের ছেলেমেয়েরা এই স্কুলে পড়ত এককালে। আজকাল পয়সাওয়ালা পরিবারের ছেলেমেয়েরা এইখানে আসে। আমার স্ত্রীর ভারি শখ মেয়েকে কনভেন্ট স্কুলে পড়াবে। সরকারি কলেজের অধ্যাপককে আর যাই হোক পয়সাওয়ালা মোটেই বলা চলে না। তবুও ওর পীড়াপীড়িতেই মেয়েকে এই স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলাম।

মেয়ে যখন বাড়িতে ফিরে ঘটনাটা প্রথমবার বলে, আমরা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম। যে কেউ উড়িয়ে দেবে।কারণ, দিনেদুপুরে এমন দৃশ্য যে আজকাল দেখা সম্ভব সেটা কেই বা বিশ্বাস করবে? আমি এই শহরের একটা কলেজে বায়ো-সায়েন্স পড়াই। সবকিছুকেই বিজ্ঞানের চোখে দেখতে ভালোবাসি। তাই মেয়েকেই একটু অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ ভেবে বকেঝকে দিলাম। ওর মাকে বলে দিলাম টিভিতে আজগুবি সিরিয়ালগুলো দেখা বন্ধ করে দিতে।

যদিও আমার মেয়ের বয়স দশ, তবুও ওর পাকা পাকা কথা শুনলে অবাক লাগে। ওদের বয়সে আমরা কত সরল আর বোকা ছিলাম। ওর বেশ কয়েকটি বন্ধু আছে যারা মাঝে মাঝেই ফোন করে এটা সেটা গপ্পো করে। সেইদিনের পর থেকে মাঝে মাঝেই শুনতাম বন্ধুদের সঙ্গে অদ্ভুত ওই ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করছে। আমি বা আমার স্ত্রী দু'জনেই ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য করতে লাগলাম। ভেবেছিলাম বাচ্চাদের ব্যাপার তো, কয়েকদিনেই ওরা অন্য কোনও নতুন বিষয়ে মজে যাবে।

কিন্ত আমাদের ভুলটা দিন পনেরোর মধ্যেই ভেঙে গেল। এবার মেয়ে আতঙ্কিত হয়ে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরল। আমি কলেজ থেকে ফিরতেই ওর মা চিন্তিত সুরে বলল, "তুমি একবার মেয়ের স্কুলে যাও তো। ব্যাপারটাকে এত হালকাভাবে নিলে আর চলবে না। নির্ঘাৎ কেউ ওর সঙ্গে বদমাইশি করছে।"

এতদিন গুরুত্ব দিইনি, এবার মেয়ের পাশে বসে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "সত্যি করে বল তো টুপুর, কী হয়েছিল। ভয় পাস না, আমি তো আছি। সব খুলে বল।"

মুখ দেখে মনে হল ও ভীষণ ভয় পেয়েছে।

প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করতে হলে আগে থেকে সময় চেয়ে নিতে হয়। তাই স্কুলে ফোন করে ব্যাপারটা হালকা করে জানিয়ে বললাম, "প্রিন্সিপ্যালের উপস্থিতিতে ওই এলাকাটার সিসি টিভির রেকর্ডিং দেখতে চাই আমি। আমাকে জানতে হবে আমার মেয়ে ঢোকার আগে ও পরে আর কোন কোন মেয়ে ওই ওয়াশরুমে ঢুকেছিল। আমি আগামীকাল কলেজে ছুটি নিয়ে স্কুলে যাব।"

প্রাইভেট স্কুলের একটা ভালো ব্যাপার যে অভিভাবকদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনা হয়। ওরাও অতি ভদ্রভাবে এবং যথেষ্ট লজ্জিত সুরে জানাল, "আপনার মেয়ের অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত। আপনি আগামীকাল সকাল এগারোটা নাগাদ স্কুলে আসুন।"

স্কুলে যেতেই আমাকে খাতির করে একজন পিওনের সঙ্গে প্রিন্সিপ্যালের ঘরে পৌঁছে দেওয়া হল। উনি নিজের রুমে ছিলেন না তখন। পিওন আমাকে বসতে বলে এসি চালিয়ে দিয়ে চলে গেল। খুব সুন্দর সাহেবি স্টাইলে সাজানো ঘরটি।কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়াল। মেঝেতে পুরু কার্পেট। দেওয়ালে বেশ কিছু ছবি। উপর থেকে ঝুলন্ত মৃদু বাদামি আলোতে ঘরে একটি আলো-আঁধারির পরিবেশ। আমি গদি-আঁটা চেয়ারে আরাম করে বসে মনে মনে খানিকটা তর্কবিতর্কের জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। কারণ আমি জানি যে, স্কুলের সুনাম অক্ষুন্ন রাখার জন্য এই সমস্ত আজগুবি বোগাস ব্যাপারকে ওরা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করবে। অবিশ্যি আমারও বিশ্বাস, এটা কোনও দুষ্টু মেয়ের কারসাজি। কিন্তু কাদের কীর্তি সেটা আমাকে জানতে হবে। পরবর্তীকালে আর কেউ যাতে আমার মেয়ের সঙ্গে এইধরনের মশকরা না করে সেটা নিশ্চিত করাও এই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য।

তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যেই রুমের লাগোয়া রিফ্রেশ রুম থেকে যে মহিলা বেরিয়ে এলেন তাঁকে দেখেই আমার মনের মধ্যের লড়াই করার ইচ্ছেটা চলে গেল। শুনেছিলাম, প্রিন্সিপ্যাল এক মারাঠি ভদ্রমহিলা। সুনন্দা থুবে। কিন্তু ভদ্রমহিলাকে দেখে ব্রিটিশ বলে ভুল হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অপূর্ব সুন্দরী বললে যেন কিছু কম বলা হয়। ধবধবে ফর্সা রং। টানা টানা নাক। একঢাল চুল। বোধহয় এইমাত্র স্নান করে বাড়ি থেকে এসেছেন, চুল ভিজে ছিল বলে এখনও বাঁধতে পারেননি।কিন্তু সেই অসামান্য রূপের মধ্যেও কোথাও যেন একটা বিষণ্ণতা লুকিয়ে আছে। আপনা থেকেই একটা শ্রদ্ধার ভাব বেরিয়ে এল অন্তর থেকে। যথাসম্ভব ভদ্র ও বিনীত ভঙ্গিতে ওঁকে সমস্যার কথাটা খুলে বললাম।

উনি আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বেশ পরিষ্কার, সাহেবদের মতো অ্যাকসেন্টে ঝরঝরে ইংরেজিতে বললেন, "এত বড়ো স্কুল, বুঝতেই পারছেন সবাইকে আমার পক্ষে চেনা সম্ভব নয়। আপনার মেয়েকে আমি ঠিক চিনি না।তবে এই যে ঘটনাটার কথা বলছেন এরকম অভিজ্ঞতা তো আগে কেউ কখনও বলেনি।"

আমি দৃঢ় সুরে বললাম, "বুঝতে পারছি ঘটনাটা চাউর হলে আপনাদের স্কুলের বদনাম হবে। কিন্তু আমিও আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত যে ও মিথ্যে বলছে না। আর আমি এটাও বলছি না যে ঘটনাটা ভৌতিক। আমার ধারণা, কোনও সিনিয়ার স্টুডেন্ট আমার মেয়েকে ভয় দেখাচ্ছে। সেই কারণেই গত কালকের দুপুর বারোটা নাগাদ সিসি টিভির ফুটেজটা একটিবার দেখতে চাই।"

প্রিন্সিপ্যাল নিজের চেয়ারটা একটু টেনে এগিয়ে এসে আমার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী দেখেছে আপনার মেয়ে?"

সাহস পেয়ে আমি বলতে থাকলাম, "কিছুদিন আগে আমার মেয়ে, অহনা ওর মাকে বলেছিল, স্কুলের বন্ধুদের মুখে ও শুনেছে ডরোথি নামে একটি মেয়ে নাকি এখানে আত্মহত্যা করেছিল। এই গল্পটা শোনার পরদিন আমার মেয়ে টিচারকে বলে ক্লাসের মাঝেই একবার ওয়াশরুম যাবে বলে বের হয়। মেয়ের মুখেই শুনেছি, ওদের ওয়াশরুমে ঢুকলে লম্বা প্যাসেজ আর তার দু'পাশে চারটে চারটে মোট আটটা পৃথক পৃথক টয়লেট। ওয়াশরুমে ঢুকে ও দেখে বাঁদিকের একটি টয়লেটের দরজা খোলা। একটি মেয়ে বসে কমোডের ওপর। পরনে স্কুলের ইউনিফর্ম।

"অদ্ভুত ব্যাপার এই যে দু'বছর আগে স্কুলের ইউনিফর্মের রং এবং প্যাটার্ন বদলানো হয়। অথচ এই মেয়েটি পুরনো প্যাটার্নের ইউনিফর্ম পরে। মাথায় লম্বা চুল। সেই চুল মুখের ওপর নামানো। তাই ওর মুখটা দেখা যাচ্ছে না। হাত-পা ধোঁয়া ধোঁয়া মতো। অহনা প্রচন্ড ভয় পেয়ে দৌড়ে বেরিয়ে আসে। পরে বন্ধুদের সঙ্গে ফিরে গিয়ে আর ওই মেয়েটিকে দেখতে পায়নি।

"গতকাল ওয়াশরুমে ঢুকে ও আবার মেয়েটিকে দেখতে পায়। মেয়েটি ভেতরে প্যাসেজের সামনেই দাঁড়িয়ে। লম্বা চুল দিয়ে মুখটি ঢাকা। আর ওর হাত-পা ধোঁয়া ধোঁয়া মতো, আবছা।"

লম্বা কথা বলে আমি একটু থেমে দম নিয়ে আবার বলতে থাকি, "দেখুন ম্যাডাম, আমি বলছি না যে এটা ভৌতিক ব্যাপার। কিন্তু আমার মেয়ে প্রচন্ড আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমার পাক্কা বিশ্বাস কোনও সিনিয়ার স্টুডেন্টের দুষ্টুমি এসব।কাইন্ডলি যদি সিসি টিভি..."

প্রিন্সিপ্যাল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বিষণ্ন সুরে বললেন, "জানেন, ডরোথি বলে একটি মেয়ে সত্যিই পড়ত এই স্কুলে।বছর তিন আগে ও ক্লাস টেনের ফাইনাল দিয়েছিল। খুবই হাসিখুশি ছিল। সামান্য পাগলাটে গোছেরও। কিন্তু কীভাবে বা কেন মারা গেছে সেটা আজও সবাই জানতে পারেনি। আমি কিন্তু জানি কারণটা।"

আমি হতবাক। স্কুলের প্রিন্সিপ্যালই যদি এমন কথা বলেন তাহলে...

আমি বললাম, "তার মানে? আপনি কি বলতে চান ডরোথির ভূত... আপনি কী বলছেন জানেন?"

আমার বিস্ময়কে অগ্রাহ্য করে ভদ্রমহিলা বলে চললেন, "ডরোথি বড্ড একা ছিল। ওর কোনও বন্ধু ছিল না।আপনার মতোই এক ভদ্রলোক সপরিবারে এই শহরে আসেন চাকরিসূত্রে। তাঁরও একটিই মেয়ে ছিল, সুজান। এই স্কুলেই পড়ত। ডরোথির সঙ্গে সুজানের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। দু'জনের কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারত না। অথচ ভদ্রলোকের ছিল বদলির চাকরি। দু'বছর পর তিনি অন্য কোথাও চলে যান এই শহর ছেড়ে। ডরোথি আবার একা হয়ে গেল। ওকে কেউ বুঝত না। বোঝার চেষ্টাও করেনি। এই বন্ধু-বিচ্ছেদের ব্যথা ও সহ্য করতে পারে না।"

ভদ্রমহিলা ছলছল চোখে শূন্যের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলছিলেন। এবার আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "কাল আপনি ফোন করার পর কথাটা আমার কানে আসে। আপনার মেয়ের ছবি আমি ফাইল খুলে দেখলাম।অবিকল সুজানের মতো দেখতে!"

"আমার মেয়েকে সুজানের মতো দেখতে!" স্তম্ভিত হয়ে আমি বলার চেষ্টা করি, "দেখুন ম্যাডাম, সবকিছুরই একটা ব্যাখ্যা থাকে, বিজ্ঞানের বাইরে তো কিছু হয় না!"

উনি ক্লান্ত সুরে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, "উঁহু, এমনও অনেক কিছু আছে যার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। বিশ্বাস না হয় আপনি নিজের চোখেই দেখুন।"

উত্তেজিতভাবে প্রিন্সিপ্যাল ম্যাডাম আমার দিকে দুটি ফাইল এগিয়ে দিলেন। প্রথম ফাইলের ওপর লেখা ডরোথির নাম। মলাট উল্টাতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি উজ্জ্বলবর্ণা হাসিখুসি লম্বাচুলের মেয়ের ছবি। নিচে নাম লেখা'ডরোথি'। পরের ফাইলটা সুজানের। মলাট খুলতেই ভিরমি খাবার জোগাড়! টুপুরের মুখ অবিকল বসানো মেয়েটির!

স্খলিত পদে প্রিন্সিপ্যালের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। পেছন থেকে করিডরে কেউ আমার নাম ধরে ডাক দিলেন, "মিস্টার শ!"

ঘুরে তাকিয়ে দেখি লম্বা, কঠিন মুখের অধিকারিণী শ্যামলা এক মহিলা আমার দিকে চেয়ে। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই উনি বললেন, "সরি, একটু লেট হয়ে গেল। আসুন, ভেতরে আসুন। আসলে সকালে ক্লাসগুলো ঠিকঠাক শুরু হল কি না আমাকে একবার নজরদারি করতে হয় তো।"

"আপনি?" আমি বিহ্বল হয়ে প্রশ্ন করি।

"আমি সুনন্দা থুবে।" ভদ্রমহিলা করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে বলেন, "প্রিন্সিপ্যাল, জোসেফ কনভেন্ট স্কুল।"

আমি হাঁ করে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে বাঁ-হাতটি প্রিন্সিপ্যালের রুমের দিকে বাড়িয়ে বলি, "তাহলে উনি কে ছিলেন?"

ভদ্রমহিলা আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন, "কে? কার কথা বলছেন?"

ভদ্রমহিলার সঙ্গে প্রিন্সিপ্যালের রুমে ঢুকে হতচকিত আমি বোঝার চেষ্টা করি ব্যাপারটা। কিন্তু মাথায় কিস্যু ঢোকে না। ঘর খালি। কেউ নেই ওখানে। অথচ এইমাত্র আমি বেরিয়েছি রুম থেকে। আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কেউ ওই ঘর থেকে বেরুতে পারবে না। ওয়াশরুমের দরজা খোলা। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ওখানেও কেউ নেই।

উনি বোধহয় আমার বিভ্রান্ত দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে আবার বললেন, "আপনি কি অন্য কারও সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছেন? আমিই এই স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। আপনি কাল ফোন করেছিলেন। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আর বলবেন না, ওসব স্কুলের সিনিয়ার স্টুডেন্টদের দুষ্টুমি আর কি। আমি বলে দিয়েছি, কেউ আর আপনার মেয়ের সঙ্গে দুষ্টুমি করবে না।তবে আমি আপনার মেয়েকেও বলে দিয়েছি, তুমি একা একা একদম ওয়াশরুমে যাবে না। যখনই যাবার দরকার হবে, সঙ্গে আরও দু-তিনজন বন্ধুকে নিয়ে যাবে।"

নজর পড়ে দেয়ালে টাঙানো অপরূপ সুন্দরী এক মহিলার ছবির দিকে। আশ্চর্য, আগে জানি না কেন খেয়াল করিনি! সেইদিকে আঙুল তুলে আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করি, "ইনি?"

একজন পিওন এসে আদেশের অপেক্ষা করছিল। প্রিন্সিপ্যাল তাকে দু'কাপ চা আনতে বলে আমার দিকে ফিরে বললেন, "উনি আগে এই স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। ভেরি স্যাড কেস, স্যার।"

একটু থেমে আনমনে টেবিলে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা ফাইলদুটো নাড়াচাড়া করতে করতে বলেন, "একটিই মেয়ে ছিল। স্বামী অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছিলেন। মেয়েটিও সবসময় মনমরা হয়ে থাকত। বেশিদিন বাঁচেনি। ক্লাস টেনে পড়তে পড়তেই... মেয়ের শোকে ভদ্রমহিলাও..."

অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে আমার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল, "আমি জানি, ওঁর মেয়ের নাম ডরোথি!"

চেয়ারে কাত হয়ে এলিয়ে পড়তে পড়তে আবছা শুনতে পাচ্ছিলাম প্রিন্সিপ্যাল সুনন্দা থুবে নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রায় চিৎকার করে বলছেন, "মিঃ শ, মিঃ শ! হোয়াট হ্যাপেন্ড? মিঃ শ! আর ইউ ওকে? হাউ ডু ইউ নো দ্যাট ডরোথি? স্ট্রেঞ্জ!"

অলঙ্করণঃ মানস পাল

গল্পঃ আনন্দময়ী হোম - মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী

আনন্দময়ী হোম

মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী

"অ্যাই ছোটু, পাঁচ নম্বরে কচুরি দুটো।"

"ছোটু, সাতে চা চারটে।"

"ছোটু, দুইয়ে ডাল।"

অনেকক্ষণ ধরে রাজু শুনে চলেছে আর ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে তারই বয়সী আরেকটা ছেলে এই শীতেও একটা হাফশার্ট-হাফপ্যান্ট পরা আর মালিকের প্লাস দোকানের সিনিয়র কর্মচারীদের ডাকে তাদের ফরমায়েশমতো কাজ করছে। সমানে দৌড়োচ্ছে আর কাস্টমার সামলাচ্ছে। তাদের খাওয়া হয়ে গেলে কেমন সটাসট টেবিল পরিষ্কার করে পরের কাস্টমারদের বসাচ্ছে।

রাজন্য ওরফে রাজু বাবা-মায়ের সাথে বিদেশে থাকে। এই প্রথম দেশে এসেছে তা নয়, তবে এই প্রথম রাস্তার ধারের আধা পরিচ্ছন্ন কচুরির দোকানে খেতে ঢুকেছে। দোকানটায় ঢোকার মুখেই বিশাল সাইজের দুটো কড়াইয়ে কচুরি ভাজা হচ্ছে। রাজু এই প্রথম উনুন দেখল। তাও আবার অত বড়ো বড়ো। চারদিকে কেমন গন্ধ ভাজা ভাজামতো, মাছি ভন ভন করছে, টেবিলগুলো একটা নোংরা ন্যাকড়া দিয়ে মুছছে। বসার জন্য একটা বেঞ্চ পাতা। কোনও গ্লাভস-টাভস না পরেই লোকে খাবার সার্ভ করছে। আবার যারা খাচ্ছে তারাও দিব্যি হাত-টাত না ধুয়েই গপাগপ কচুরি মুখে পুরছে। অর্ডার নিচ্ছে আধময়লা জামাকাপড়ের একজন মানুষ। কিন্তু সাপ্লাই দিচ্ছে ছোটু নামের সেই ছেলেটা।

রাজুরা সকালে কিছু না খেয়ে বের হয়েছে। বাবা-মায়ের প্ল্যানই ছিল এমন একটা দোকানে ব্রেকফাস্ট করবে। রাজুকে বারে বারে বুঝিয়েছিল এমন করে খাওয়াটা নাকি দারুণ মজার। রাজুর কিন্তু একটুও মজা লাগছে না। তাও খেতে বাধ্য হচ্ছে কারণ, এরপর যে কোথায় খাওয়া হবে কেউ নাকি জানে না। রাজুরা ওর কাকা-কাকিমা আর তাদের যমজ ছেলেমেয়ের সাথে বেরিয়েছে। বড়োদের ইচ্ছে যেদিকে দু'চোখ যায় যাবে, কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম মানা নেই। যেখানে ইচ্ছে খাবে, কোথাও একটা রাত কাটালেই হল। আজকাল রাত কাটানোর মতো ভালো হোটেলের অভাব আছে নাকি? তবে রাস্তার ধারের এইসব দোকান যাকে বড়োরা হোটেল বলছে, আরেকটা কী যেন, ধাবা না কী এসবে খাওয়ার মজাই নাকি আলাদা। রাজু জানে, ওর মতামত কেউ চায় না। বড়োরা যেটা ডিসিশন নেবে সেটাই হবে। মা, যে নাকি ওই দেশে সবসময়ে রাজুর হাত ধোওয়া নিয়ে পিটপিট করে, যেখানে হাত ধুতে পারে না হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করায়, সেই হেন মাও দিব্যি হাত ধোওয়া-টোওয়ার তোয়াক্কা না করে খাচ্ছে আর সমানে খাবারগুলোর প্রশংসা করছে এবং ফিরেও দেখল না রাজু হাত ধুল কি না, ওর হ্যান্ড স্যানিটাইজার চাই কি না। বাবা, কাকা, কাকিমা তো খাচ্ছে বটেই, এমনকি ওই পুঁচকি পুঁচকি ভাইবোনগুলোও কেমন বেঞ্চির ওপর নিলডাউন হয়ে কুপ কুপ খাচ্ছে কচুরি আর ছোলার ডাল।

বেচারা রাজু উপায় নেই বুঝে খেতে থাকে কচুরি। যদিও ব্রেকফাস্ট মানেই তার কাছে হয় দুধ, সিরিয়াল, নাহলে প্যানকেক, সসেজ, অমলেট বা ব্রেকফাস্ট স্যান্ডউইচ। উইকএন্ডে বাড়িতে মা কখনও কখনও লুচি বানায়, কিন্তু সে দিনগুলোতে বড়ো কষ্ট হয় রাজুর। মাকে বললে রেগে আগুন হয়ে যায় অথচ রাজুর কেন জানি লুচি-টুচি ঠিক ভালো লাগে না।

যাই হোক, অতি কষ্টে দুটো কচুরি খাবার পর দেখে বড়োরা মিষ্টি খাচ্ছে। তাদের অবশ্য ততক্ষণে চার-পাঁচ প্লেট করে কচুরি-ডাল খাওয়া শেষ। রাজু মিষ্টি ভালোবাসে। কাজেই ভালোবেসেই খেল। সবই করছে কিন্তু চোখ ঘুরছে ওই ছোটুর সাথে সাথে। এরই মধ্যে এক ভদ্রলোক ছোটু নামের ছেলেটাকে কিছু টাকা মনে হয় টিপস হিসাবে দিয়েছেন।ছেলেটাও সেটা পকেটে রেখেছে। ওমা, দোকানের মালিক সেটা দেখতে পেয়ে কাছে ডেকে ওই একদোকান লোকের সামনে ছেলেটাকে জোরে থাপ্পড় মেরে কেড়ে নিল টাকাটা! কেউ একটা কোনও কথা না বলে যেমন খাওয়াদাওয়া করছিল করতে থাকল। দৃশ্যটায় রাজুরই চোখে জল আসছিল অপমানে। তাকে যদি কেউ এমন করত? কত প্রশ্ন মনে আসছে রাজুর। আচ্ছা, এই ছেলেটার শীত করে না? ছেলেটা স্কুলে যায় না? ওর কি এই কাজ করতে ভালো লাগছে? ও ব্রেকফাস্ট করেছে? এত কথা মনে হচ্ছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করে কাকে? বাবারা তো তখন চা সহযোগে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে ধুন্ধুমার লাগিয়েছে। যেন এই টেবিলে যে ডিসিশন নেওয়া হচ্ছে সেটাই ঠিক আর সেই পথে চললে তবেই দেশের ভালো হবে। মা আর কাকিমা অবশ্য নিচু গলায় কীসব শাড়ি, পার্টি নিয়ে আলোচনা করছে। খানিকক্ষণ রাজু মন দিয়ে দেখল বড়োরা এমনকি ছোটো ভাইবোনও নিজেদের নিয়ে মশগুল। খাওয়া শেষ হতে না হতেই কাকা, কাকি ওদের দু'জনের মোবাইল ধরিয়ে দিয়েছে ভাইবোনদের। ফলে তারা মন দিয়ে কী দেখে যাচ্ছে। বড়োদের কত সুবিধা। নাহ্, রাজু অনেকক্ষণ উঁকিঝুঁকি দিয়েছে, ছোটু বলে ছেলেটা আপাতত দোকানের পেছনদিকে কী জানি করছে। রাজু এক পা এক পা করে যেতে থাকল। দেখল কেউ খেয়াল করছে না তাকে। অতএব এটাই সুযোগ।

দোকানের পেছনদিকটা কিন্তু দোকানের সামনের থেকেও নোংরা। চারদিকে রান্নাঘরের, তারপর বাসন ধোওয়া জল। ফলে কাদা কাদা হয়ে আছে। এককোনায় ডাঁই করা সব্জির খোসা, চায়ের পাতা। বেশ পচা পচা গন্ধ সব মিলিয়ে। আর দেখে ছোটু বসে বসে বড়ো বড়ো বাসন মাজছে ব্রাউন রঙের রাফ মতো কী যেন দিয়ে। মায়ের মতো সাবান দিয়ে নয়। একবার করে টিউবওয়েল পাম্প করে জল নিচ্ছে, আবার বসে বাসন মাজছে। রাজু একটু সময় দাঁড়িয়ে দেখল।তারপর সব ভুলে চলে গেল ছোটুকে হেল্প করতে। এতক্ষণ বেশ খারাপ লাগছিল নোংরা গন্ধ, বাজে জলে তার পায়ের দামী স্নিকার্স ভিজে যাচ্ছে বলে। কিন্তু তারই বয়সী একটা ছেলে এভাবে কাজ করছে দেখে আর থাকতে পারল না রাজু। সে গিয়ে টিউবওয়েল পাম্প করতে শুরু করতেই ছোটু মানা করল একগাল হেসে, "তুমি পারবে? তোমার জুতো ভিজে যাবে তো!"

"হ্যাঁ যাবে। কিছু নেই।"

রাজু জানে ওর বাংলাটা একটু পুওর। জীবনে প্রথম মা-বাবার বকুনিকে উপেক্ষা করে এমন কাজ করতে পারছে, সেটাই বা কম কী রাজুর কাছে? ঘটাং ঘটাং করে পাম্প করতে থাকে, দু'জনেই অকারণ হাসে। ওদের দেখে রান্না ঘরের ভেতর থেকে বড়ো কর্মচারীরা উঁকি মারে।

"হোই ছোটু, হাত চালা।" ধমক উড়ে আসে।

বাসন ধোওয়া হলে ক'টা কচুরি, তার ওপর একটু ডাল কোনও প্লেট-টেট ছাড়াই নিয়ে কল-পাড়ে খেতে বসে ছোটু। বসল ঠিকই, কিন্তু একটার বেশি খেল না।

"তোমার নাম কি ছোটু?" নিজের বাচনভঙ্গী নিজেরই কানে লাগে রাজুর।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে দেখে বুঝল ছেলেটা ওর কথা একবর্ণও বোঝেনি। তাই আবার ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল। এবারে উত্তর পেল, "না, আমার নাম গজানন। গণেশঠাকুর জান? তার নাম। দোকানের মালিক ছোটু বলে, তাই সবাই ছোটু ডাকে। তোমার নাম কী?"

"রাজু।"

"তুমি কি বিদেশে থাক?"

"হ্যাঁ। আমি কি তোমায় প্রশ্ন করতে পারি?"

"কী?"

"তোমার শীত করে না? স্কুলে যাও না?"

"নাহ্, কাজ করতে করতে গরম লাগে। আর স্কুলে গেলে খাব কী?"

ব্যাপারটা রাজুর বোধগম্য হল না। "মানে?"

"মা নেই তো, আর বাবাও চলে গেল। আমি তো সবার বড়ো। ছোটো ভাইবোন তিনটেকে খাওয়াতে হবে না?"

ওরা কথা বলতে বলতে রাজু দেখল ওর খুড়তুতো ভাইবোনের সাইজের দুটো, আরেকটা আরও ছোটো আধা কাপড় পরা বাচ্চা এসে উপস্থিত। আর গজানন ওরফে ছোটু নামের ছেলেটা কচুরিগুলো ওদের দিয়ে নিজে পেট ভরে জল খেয়ে নিল টিউবওয়েল থেকে।

এর মধ্যেই রাজুর বাড়ির লোকজনও খোঁজ করে রাজুকে ওই নোংরা পরিবেশ থেকে উদ্ধার করল। আর হোটেলের বড়ো কর্মচারিরাও ছোটুকে ধমকে আবার কাজে টেনে নিল। এখন তো কচুরির পাট শেষ, দুপুরে ভাত খাওয়ার খদ্দেররা আসবে। কাজেই ছোটুকে তো কাজে দরকার। কারণ, গজানন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে লোকেদের ডেকে আনবে, সাথে সকালের কাজগুলো তো আছেই। রাজুর যে কত কথা জানার ছিল। আবার যা দেখল সেগুলোকে মনে মনে হিসেব কষে মেলাতেও হবে।

গাড়িতে যেতে যেতে চুপ করে ভাবতে থাকে রাজু। ঠাকুমার কাছে কতরকমের গল্প শুনেছে এই ক'দিনে। তাতে গণেশঠাকুরের গল্পও শুনেছে। যেহেতু গজ মানে হাতির মতো আনন মানে মুখ, তাই গণেশঠাকুরের অন্য নাম গজানন। আর এটাও বুঝল, যেহেতু ওই ছেলেটা তার ভাইবোনদের সবার বড়ো তাই গণেশঠাকুরের নামে নাম। সব ঠাকুরের আগে গণেশঠাকুরের পুজো করতে হয় কিনা। আর ওই বাচ্চাগুলোই তার মানে ছোটুর ভাইবোনেরা। এই অবধি তো হিসেব মিলল। কিন্তু দোকানের মালিক কেন গজাননকে ঠিক করে খেতে দেয় না? বা ও তো কাজ করে দিচ্ছে, তাহলে ওর ভাইবোনগুলোকে অ্যাট লিস্ট একবেলা তো খেতে দিতেই পারে! অবশ্য দুপুরের খাওয়ার সময়ের আগেই তো ওরা চলে এল। দুপুরে কী হয় সেটাও তো রাজুর জানা হল না। রাজুর মন কেমন করতে লাগল। ওর দাদামশায়ের কাছে যেতে মন চাইল। একমাত্র তিনিই বোধহয় ওর সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন। আর কেমন করে গজাননকে হেল্প করতে পারত রাজু বলে দিতে পারতেন। কিন্তু এখন তো রাজু ফেরবার কথা বলতেই পারবে না। বড়ো রাস্তায় রাজুদের গাড়ি ছুটছে হু হু করে। চারপাশে কেমন সবুজ মাঠ, ধানক্ষেত। জানালা দিয়ে হাঁ করে দেখছিল রাজু।

গাড়িতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল রাজু নিজেও টের পায়নি। মা যখন ঘুম ভাঙাল ততক্ষণে দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। একটা সুদৃশ্য রিসর্টে তাদের গাড়ি দাঁড়ানো। এখানেই থাকা হবে বুঝল রাজু। ঘুম ভাঙতেই ক্ষিদেয় পেট চুঁই চুঁই করে।

দুটো তিনটে দিন ওদের বেশ কাটল। মা, কাকিমা ব্যাপক খুশি কারণ, রান্না নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে না। শুধু অর্ডার করার অপেক্ষা, ভালো ভালো মনপসন্দ খাবার হাজির হচ্ছে। বাড়িতেও রান্না করতে হয় না, কিন্তু সেখানে তো অ্যাট লিস্ট বলে দিতে হয় কোন সময় কী রান্না হবে। তায় প্রচুর পরিমাণে হ্যান্ড ক্রাফ্টেড জিনিস কিনেছে দু'জন মিলে। শাড়ি,গয়না, ঘর সাজানোর কী কীসব। রাজু নিজের মনে ঘুরে বেড়িয়েছে আর হিসেব কষে গেছে। লক্ষ করেছে বাবা-মায়ের কথা একবারে শুনে নিলেই ওরা খুশি থাকছে। আর কোনও কিছু নিয়ে ডিস্টার্ব করে না। কাজেই সময়মতো ঘুম থেকে ওঠা, ব্রাশ করা, চান-খাওয়া সব ঠিক ঠিক করে করেছে রাজু। এক তো গজাননকে দেখে ভয় হয়েছে, মা বাবা না থাকলে তারও তো ওইরকম দশা হতে পারে। আর দুই, গজাননকে হেল্প করতে গেলে নিজেকে ডিসিপ্লিনড হতে হবে। বড়োদের কথা না শুনলে তারাই বা ওর কথা শুনবে কেন?

বাবার মুড ভালো দেখে ফেরার পথে নিজের আর্জি পেশ করল রাজু, "বাবা, ক্যান উই গো টু দ্যাট হোটেল থিঙ্গি আগেন?"

"কোন হোটেল?"

"দ্যাট হোটেল হোয়্যার উই হ্যাড খচুরি, হোয়াইল উই ওয়্যার কামিং হিয়ার।"

"ওরে ওগুলোকে কচুরি বলে, খচুরি না। ওই হোটেলে আবার খাবি?"

"হোয়াট এভার, ক্যান উই বাবা? প্লিজ!"

বাবা কী বুঝল কে জানে। হ্যাঁ বলে দিল রাজুর কথায়।

রাজু এবারে দেশে আসার পর থেকে কত লোক ওকে মানি দিয়েছে গিফ্ট হিসেবে। মা বলে দিয়েছে ওগুলো সব রাজুর। ও ওর ইচ্ছেমতো স্পেন্ড করতে পারবে। রাজু কাউন্ট করে দেখেছে টোটাল টোয়েন্টি ফাইভ থাউসেন্ট রুপিস আছে ওর। রাজু যদিও সঙ্গে এনেছে কিন্তু কোথায় বা খরচ করবে ও? কাজেই রাজু এটাই ঠিক করেছে ও সবটা টাকা গজাননকে দিয়ে দেবে। আর প্রথম যেদিন এই রিসর্টে এল, সেই রাতেই খাবার সময়ে কিছুটা ইচ্ছে করে, কিছুটা ধাক্কা লেগে রাজু এবং ওর ভাইবোনদের জামাকাপড়ে মাংসের ঝোল মেখে গেছিল। মা, কাকি ফেলে দিতে গেলে রাজু চ্যাঁ ভ্যাঁ করেছিল ওটা নাকি ওর খুব ফেভারিট, পরতে না পারলেও ফেলতে দেবে না। আসল উদ্দেশ্য কিন্তু রাজুর অন্য ছিল।

প্রায় সন্ধে নাগাদ রাজুরা যখন গজাননদের হোটেলে পৌঁছল, তখন চা-বিস্কুট ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাচ্ছে না দোকানে। দোকানের মালিক আর গজানন ছাড়া আর কর্মচারীও কেউ নেই দোকানে। রাজুরা আসতেই গজানন চিনতে পেরেছে রাজুকে। ওরা যখন চা খাচ্ছে মালিক তখন কোনও কাজে দোকানের বাইরে গেল। রাজু দেখল এই সুযোগ। চট করে প্যাকেট করা জামাকাপড়গুলো আর টাকাগুলো গজাননকে দিয়ে বলল, "তুমি ইউস কোরো।"

আগের দিনের ঘটনা মনে পড়তেই গজাননকে চট করে প্যাকেটটা লুকিয়ে ফেলতেও বলল। গজানন ওই ঘটনায় অভ্যস্ত। কাজেই রাজু বলার আগেই ও লুকোচ্ছিল। রাজুর সঙ্গে থাকা বড়োরা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। রাজু ওদেরকে সবটা এক্সপ্লেন করল। আর মাথা নিচু করে বলল, "সরি, তোমাদের জিজ্ঞেস না করেই আমি ডিসিশন নিয়ে ওকে দিয়ে দিলাম।"

একে একে রাজুর মা, বাবা, কাকু, কাকিমা ওকে জড়িয়ে ধরে ওরা কতটা প্রাউড রাজুর এই কাজে সেটা বলল।আর প্রমিস করল, এবার থেকে ওরাও রাজুর মতোই গজাননদের নিজের সাধ্যমতো হেল্প করবে। আর সেটা আজ থেকেই শুরু, এই গজাননকে দিয়েই। অতএব বাবা, মা, কাকা, কাকিমাও নিজেদের পার্স উপুড় করে দিল। এবারে আর রাজুকে কোনও বাধা দিল না কেউ। রাজু তার বন্ধু গজাননকে জড়িয়ে ফটো তুলে, বাই করে রওনা দিল বাড়ির উদ্দেশ্যে। যদিও আর কখনও দেখা হবে কি না সেসব ভেবে মন খারাপ হচ্ছিল রাজুর।

এমন একটা কাজ করতে পেরে, বড়োদের সাহায্য পেয়ে আনন্দে ডগমগ রাজু বাড়ি ফিরে দেখে ওর দাদুন এসেছেন। অতএব দাদামশায়, দাদুন দু'জনকে একসাথে হৈ হৈ করে শোনাল রাজু গজাননের গল্প। ওর সাথে তোলা ছবিটাও দেখাল। বাবাদের কাছ থেকে গজাননদের দোকানটার লোকেশন জেনে নিয়ে বেশ রহস্য করে করে গল্পের মতো করে পুরোটা বলল রাজু। দাদা, দাদুন, ঠাম্মা সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন রাজু ছোটো হলেও খুব বড়ো মনের পরিচয় দিয়েছে।

পরদিন সকালে একটা ফোন পেয়ে বাড়িতে হুলুস্থুল। দাদুন নাকি অসুস্থ বোধ করছেন আর তাই ডেকে পাঠিয়েছেন সবাইকে। মা টেনেটুনে রাজুকে ঘুম থেকে তুলে সবাই মিলেই দৌড়ল দাদুনের বাড়ি। কিন্তু তখন কি আর জানত সেখানে কী সারপ্রাইস অপেক্ষা করে আছে? দাদুনের বাড়ি গিয়ে দেখে দাদুনের শরীর খারাপটা বানানো। উনি ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলেছেন। সেটা না হলে তো আর কেউ এমন দৌড়ে দৌড়ে আসত না। মিথ্যে বলার জন্য অবশ্য দাদুন মাফ চেয়ে নিলেন সবার কাছে। তবে দাদুনের অনেকদিনের স্বপ্ন পূরণ করেছে রাজু। কীভাবে? রাজু গজাননকে হেল্প করায়, ওর সমস্ত ইনফরমেশন দেওয়ায় দাদুন গিয়ে গজানন আর ওর ভাইবোনদের নিয়ে এসেছেন নিজের কাছে।

অগাধ সম্পত্তির মালিক দাদুন। অনেকদিন ধরেই এইরকম ছেলেমেয়েদের জন্য একটা থাকার, খাওয়ার, পড়াশোনা শেখার শেল্টার করবেন বলে ভেবেছিলেন। যেখানে ওরা থাকবে, চাইলে বাড়ি যেতে পারবে বা ওদের বাবা-মায়েরা দেখা করতে পারবে। ওদের মানুষের মতো মানুষ করার, সুস্থ সুন্দর একটা জীবন দেবার চেষ্টা করবেন দাদুন। দিদুন মারা যাবার পর একদম একা হয়ে গিয়েছেন দাদুন। গত রাতে রাজুর কাছে গজাননের কথা শুনে ওঁর মনে হয় এদের দিয়েই শুরু করার কথা। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। দোকানের মালিক যে খুব সহজে আসতে দিয়েছে গজাননকে তা নয়। তবে দাদুনের খুব বুদ্ধি। আর কত মানুষের সাথে যোগাযোগ! সেইসব কাজে লাগিয়ে দাদুন উদ্ধার করেছেন গজাননদের। রাজুর আর বিদেশ ফিরতে মন খারাপ রইল না। এবার থেকে চাইলেই তার নতুন বন্ধু গজাননের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে।আর যখনই এদেশে আসবে দেখা তো হবেই।

রাজুর সাজেশনে ওদের নতুন আস্তানার নাম হল 'আনন্দময়ী হোম', দিদুনের নামে।

অলঙ্করণঃ পুণ্ডরীক গুপ্ত

গল্পঃ শব্দ - রুচিস্মিতা ঘোষ

শব্দ

রুচিস্মিতা ঘোষ

সে এসেছে। রোজ এসময়ই একটা শব্দ শুনতে পাই। মনে হয় ঘরে কেউ আছে। অদ্ভুত একটা শব্দ। রোজই কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করি। বুঝতে চাই কীসের শব্দ। বুঝতে পারি না। শব্দটা থামে মাঝে মাঝে, আবার শুরু হয়। কতক্ষণ এভাবে জেগে থাকব? ঘুম নেমে আসে চোখে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ি।

আজ রবিবার। রাতে জাগব বলে দুপুরে একচোট ঘুমিয়ে নিয়েছি।

মছলন্দপুরের মতো এক অজ পাড়া-গাঁ থেকে কলকাতায় এসেছি। এটা আমার মামাবাড়ি। আমার বাবা এক গরিব ইশকুল মাষ্টার। মাধ্যমিক পাশ করার পর বাবা হস্টেলে রেখে আমায় কীভাবে পড়াবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। আমার মামার অবস্থা বেশ ভালো। গড়িয়াহাটে তাঁর সোনার গয়নার দোকান আছে। আমার রেজাল্ট ভালো হয়েছে শুনে মামা বললেন, টুকাই আমার বাড়িতে থেকে পড়বে। বাবা এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হয়েছি। মামাবাড়িতে সদস্য সংখ্যা আট। মামার তিন ছেলেমেয়ে। এক দূরসম্পর্কের বিধবা মাসি ও তার দুই মেয়ে থাকে এখানেই। আর সারাদিনের কাজের লোক নকুড়দা। ঠিকে ঝিরা আসে। কাজ সেরে চলে যায়।

আপাতত একতলার এই গুদামঘরে আমার জায়গা হয়েছে। মামা বলেছেন, টিকলুদার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সামনে। পাশ করে সে হস্টেলে চলে যাবে। তখন টিকলুদার ঘরটা আমি পেয়ে যাব। কয়েকমাসের ব্যাপার। আমি রাজি হয়েছি। এমনিতেই আমার কষ্ট সহ্য করার অভ্যেস আছে।

এই ঘরে একটাই মাত্র জানালা। খোলা থাকলে রোদ, আলো, বাতাস সবই আসে। তবে এতদিন বন্ধ ছিল বলে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ। একটা তক্তপোষ। সেটার পায়াগুলোর নিচে খান কয়েক ইট রেখে উঁচু করা হয়েছে। তক্তপোষের নিচটা নানারকমের জিনিস দিয়ে ঠাসা। তক্তপোষের পাশে একটা ছোটো টেবিল আর চেয়ার রেখেছি। টেবিলের উপরে আমার বইপত্র সাজানো। দেয়ালে জামাকাপড় ঝোলানোর হুক টাঙিয়েছি। আমার ছাড়া শার্ট-প্যান্ট সেখানে ঝুলিয়ে রাখি। একটা ছোটো স্যুটকেসে আমার বাকি জামাকাপড়। এই আমার সম্পত্তি। এক সপ্তাহ হল আমি কলেজে যাচ্ছি। বাসে চেপে গেলে মাত্র কুড়ি মিনিট লাগে। খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করছি। কিন্তু প্রতিদিন রাতে ঘুমের ব্যাঘাত। কথাটা আমি এখনও পর্যন্ত কাউকে বলিনি। রাতে ভালো ঘুম হয় না বলে পরেরদিন ক্লাস করতে করতেই ঘুম পেয়ে যায়।

আজ রাতে আমি জেগে আছি। টিকলুদার থেকে একটা টর্চ যোগাড় করেছি। ঘরের আলো জ্বেলে রেখে আমি ঘুমোতে পারি না। রোজ রাতে যে আসে, তার মনে হয় অন্ধকারেই কাজকর্মের সুবিধা। দু-একদিন আলো জ্বালিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। কাউকে দেখতে পাইনি। কোথায় যে লুকিয়ে পড়ে! শব্দটাও থেমে যায় আলো জ্বালালেই। একবার মনে হল চোর নয়। এই ঘরে এমন কীই বা সম্পত্তি আছে, যে চুরি করতে আসবে!

চোখ বুজে চুপ করে শুয়েছিলাম। সে এসেছে, টের পেলাম। সতর্ক হলাম। জানালাটা খোলা। তাই মৃদুমন্দ হাওয়া খেলছে ঘরে। আর সেই হাওয়ায় আমার মশারিখানা নৌকোর মতো দুলছে। রাস্তায় একেবারেই আলো নেই। তাই ঘরভরা অন্ধকার। তক্তপোষের নিচে ঢুকেছে সে। কারণ, শব্দটা সেখান থেকেই আসছে। কী এমন সম্পত্তি আছে সেখানে! তক্তপোষের তলায় হাবিজাবি জিনিস দিয়ে ঠাসা। আমার কোনওদিনও কৌতূহল হয়নি জিনিসগুলো নিয়ে। পুরনো জিনিসপত্র ছাড়া আর কীই বা হতে পারে! কিন্তু আজ একটা হেস্তনেস্ত করব। যদি চোর হয়, আর সেই চোরকে আমি ধরতে পারি, তবে নিশ্চিত মামাবাড়িতে আমার দাম বেড়ে যাবে। মুনিয়া আর রিমলি-ঝিমলির চোখে হিরো হয়ে যাব। টিকলুদা সাবাসি দেবে। পিকলু অবশ্য হিংসে করবে। এমনিতেই সে আমাকে বিশেষ পছন্দ করে না। ভাবটা এমন, যেন কোথা থেকে এসে জুড়ে বসেছে! আমি এখানে আসার পর হয়তো তার ভাগের মাছের টুকরোটা একটু ছোটো সাইজের হয়ে যাচ্ছে। মুনিয়ার কাছেই শুনেছি, পিকলুর প্রিয় খাবার নাকি মাছ। এ ছাড়া আমাকে হিংসে করার আর কী কারণ থাকতে পারে!

আজ তৈরি হয়েই শুয়েছিলাম। এই ঘরের কোণে একটা মোটা লাঠি পড়েছিল। সেই লাঠিটা মাথার কাছে নিয়ে শুয়েছি। শব্দটা শুনে মশারি তুলে সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে নামলাম। আমার এক হাতে টর্চ আর এক হাতে লাঠি। চোরটা কি তক্তপোষের নিচেই? ওখান থেকেই ঠুং-ঠাং শব্দ আসছে। আমি খুব সাবধানে মেঝেতে বসলাম। মাথা নিচু করে তক্তপোষের নীচটা দেখতে চাইছি। এত অন্ধকার, ঠিকমতো কিছু ঠাহর হচ্ছে না। এখনই টর্চ জ্বালালে আমি বেকায়দায় পড়তে পারি। আবার টর্চ না জ্বালালে কিছুই দেখতে পারছি না। তাই ঝুঁকি নিয়েই আমি টর্চটা জ্বালালাম। দেখি, একটা টিনের রংচটা তোরঙ্গ, কিছু কাঁসার বাসনপত্র আর তিনটে বস্তা রয়েছে তক্তপোষের নিচে। তাহলে কাঁসার বাসনে ধাক্কা লেগেই ঠুং-ঠাং শব্দ হয়েছিল। পেটমোটা বস্তাগুলোয় আবার কী আছে? সোনাদানা কি কেউ বস্তায় ভরে রাখে? ব্যাঙ্কের লকার আছে, তাছাড়া মামীমার ঘরে তিন-তিনটে লোহার আলমারি। সোনাদানা রাখলে তো সেখানেই রাখবে। আর ওই পুরনো তোরঙ্গে এমন কিছুই থাকতে পারে না। সবচেয়ে বড়ো কথা, আমি যা ভাবছিলাম তা নয়। তক্তপোষের নিচে কোনও মানুষের অস্তিত্বই নেই। তবে? আমি টর্চের আলো ঘোরাতে থাকলাম। এদিকে আমার কৌতূহলের পারা ক্রমশ চড়ছে। যদি কোনও অশরীরী আত্মা হয়! একটু একটু যে ঘাম হচ্ছে না, তা নয়। গলাটাও শুকিয়ে গেছে। তবু সাহসে ভর করে মাথা নিচু করে আমি তক্তপোষের নিচে ঢুকলাম। সে অন্ধকারেই বোধহয় স্বচ্ছন্দ ছিল। হঠাৎ এক অদ্ভুতুড়ে আলো আর একজন মানুষের উপস্থিতি তাকে ঘাবড়ে দিয়েছে। কারণ, শব্দটা এখন আর শুনতে পাচ্ছি না। আমি প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বস্তাগুলোর কাছে পৌঁছে গেলাম। এক এক করে টর্চ ফেললাম বস্তাগুলোর মুখের কাছে। দুটো বস্তার মুখ সেলাই করা, একটা বস্তার মুখ শুধু খোলা। কী আছে এতে! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তবু আমি অল্প মাথা উঁঠিয়ে মুখখোলা বস্তাটার ভেতরে হাত ঢোকালাম। মনে হল, একটা নরম লোমশ প্রাণীর গায়ে হাত দিলাম। ভয়ে শিউরে উঠলাম। এবার টর্চের আলোটা ফেললাম বস্তার ভেতরে। দেখি বস্তাভরা চাল আর তার মধ্যে বসে আছে এক প্রকান্ড সাইজের ইঁদুর। ধূসর তার গায়ের রঙ। কালোপুঁতির মতো চোখদুটো জ্বলছে। সে এমনভাবে আমাকে দেখছে যে, পারলে চাল

ছেড়ে সে আমাকেই চিবিয়ে খাবে।ইঁদুরটা কিন্তু মোটেও ভয় পেল না। বরং আমাকে দেখে বিরক্ত হল। কারণ, এই ঘরটাই ওর রাজত্ব। দিনের বেলায় সে লুকিয়ে থাকে, কারণ গুদাম ঘর হওয়ার জন্য বাড়ির মেয়ে-ঝিরা নিশ্চয়ই এ ঘরে যাতায়াত করে। ইঁদুরবাবাজি তাই বেরোন রাতের বেলায় চুপিচুপি। এতদিন টের পায়নি তার সাম্রাজ্য দখল করে বসে আছে আর একজন। এবার ঘরে পাহারা বসেছে।

ইঁদুরটা এতদিন জানত, এখানে বস্তা বস্তা চাল, যতখুশি খাও, বাধা দেবার কেউ নেই। এখন সে ধরা পড়ে গেছে। কিচকিচ একটা আওয়াজ করে সে প্রতিবাদ জানাল। তারপর আমার হাতে দাঁত বসাতে গেল। ভাগ্যিস! আমি ঠিক সময়মতো আমার হাতটা সরিয়ে নিয়েছি। আমার হাতের থেকে টর্চটা পড়ে গেল। নেভেনি। টর্চের আলোটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ইঁদুরটা এবার বেরিয়ে এল বস্তার ভেতর থেকে। মাটি ঘেঁষে, আধা অন্ধকারে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল পেছনের পায়ে ভর করে। অনেকটা আমারই মতো বসা তার। সামান্য উবু হয়ে বসে মানুষ যেমন হুঁকো থেকে তামাক টানে, বসার পোজটা ঠিক তেমনই লাগছে।

ইঁদুরটা এতটুকু নড়ল না। এ কী রে বাবা! একটা জলজ্যান্ত মানুষ তার সামনে বসে আছে, আর সে ভয় পাচ্ছে না মোটে! আমার খুব রাগ হচ্ছে। অপমানিত বোধ করছি। এবার চরম বিরক্তিতে সে পেছনের একটা পা তুলে আমাকে লাথি দেখাল। তারপর মাটিতে গড়াগড়ি খেল কিছুক্ষণ। আবার উঠে বসল। তার চোখের দৃষ্টি এবার আস্তে আস্তে একটু করুণ হয়ে আসছে। আমার মনে হল, সে বলতে চাইছে, এস, সন্ধি করি। এই ঘরে এতদিন আমার একমাত্র অধিকার ছিল। এখন তুমি কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছ। তোমাকে মাফ করলাম। এবার কেটে পড়। তুমি তোমার নিজের কাজ কর, আমাকে আমার কাজ করতে দাও। এই ব্রহ্মরূপ খাবার খেয়ে আমি প্রাণধারণ করি।

আমার এবার সত্যি সত্যি দয়া হল। সত্যিই তো আমি এই ঘরে উড়ে আসা এক জীব। এই গুদামঘরে ওর পূর্ণ অধিকার। হয়তো ওর এখানেই জন্ম, এখানেই বড়ো হয়েছে, এখানেই মৃত্যু ঘটবে। আমি এই ঘরে আর ক'দিন! ইঁদুরটাকে চোখের ইশারায় আশ্বস্ত করে আমি হামাগুড়ি দিয়ে তক্তপোষের নিচ থেকে বেরিয়ে এলাম।

মশারি তুলে বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছি। টর্চ নিভিয়ে বালিশের পাশে রেখে দিলাম। চোখে ঘুম নেমে আসছে। শুনতে পাচ্ছি আবার সেই শব্দ। ইঁদুরটা মনের সুখে চাল চিবোচ্ছে। আর কিচকিচ শব্দে আমাকে বোধহয় কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

অলঙ্করণঃ পুণ্ডরীক গুপ্ত

গল্পঃ অনেক কিছু পাওয়া - কিশোর ঘোষাল

অনেক কিছু পাওয়া

কিশোর ঘোষাল

তোয়ার ঘুম ভেঙেছে একটু আগে। বাবা মাঝে মাঝে বলেন, 'আর্লি টু বেড আর আর্লি টু রাইজ, মেকস আ ম্যান হেলদি অ্যান্ড ওয়াইজ।' ক্লাস টুতে পড়া তোয়া ইংরিজি ওই শব্দগুলোর মানে জানে। আর তার ঠাম্মি এ ছড়াটার যে বাংলা করেছে, সেটা আরও বেশি মজার!

'তাড়াতাড়ি করলে ঘুমু, ঠাম্মা দেবে অনেক চুমু। উঠে পড়ো থাকতে ভোর, জ্ঞানের সাথে বাড়ে জোর।'

অন্যদিনের মতো আজও খুব সক্কালে ঘুম ভেঙে উঠে তোয়া দেখল মা-বাবা ঘুমোচ্ছেন। অন্যদিন ওঁরাও উঠে পড়েন, কিন্তু আজ রবিবার কিনা, তাই একটু বেলা করবেন উঠতে। তোয়া ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসতেই খোলা জানালা দিয়ে তার বন্ধুরা ডাকাডাকি শুরু করে দিল। বুলবুলি বলল, "তোয়াদিদি, তোয়াদিদি, আজ কিন্তু তোকে, আমি প্রথম ডেকেছি, নতুন আলোর ঝোঁকে।"

শালিক যেমন খুব মজা করে, তেমন ঝগড়াও করে। সে বলল, "বল তো দেখি তোয়, তোর কী মনে হোয়, কে বেশি হিংসুটি? আমি? না বুলবুল কেলে ঝুঁটি?"

তোয়া মুখে হাতচাপা দিয়ে নিঃশব্দে দুলে দুলে হাসল কিছুক্ষণ। তারপর ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে ইশারায় বলল, "অ্যাই অ্যাই, চুপ চুপ, করিস না রে ঝগড়া, মা-বাবার ভাঙলে ঘুম সব কিছুতেই ব্যাগড়া!"

খুব আ-আস্তে আ-আস্তে বিছানা থেকে নেমে তোয়া মেঝেয় যেমনি পা দিল, মা আধখানা চোখ মেলে আলসে গলায় বললেন, "ছাদে যাচ্ছ যাও, কিন্তু আলসে দিয়ে ঝুঁকবে না।"

তোয়া সবসময় দেখেছে ঠাম্মি, দাদুন, বাবাকে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু মাকে? অসম্ভব! মা দুগ্গার মতো তিনচোখ না থাকলেও মা সব দেখতে পান, সব বুঝতে পারেন। মেঝেয় নেমে মায়ের গালে হামি খেয়ে তোয়া হাল্কা পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা পেরিয়ে দৌড়ে উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে।

সক্কাল সক্কাল ছাদে উঠতে তোয়ার খুব মজা লাগে। আকাশজুড়ে নরম নরম আলো। ঝিরঝিরে হাওয়া। চারদিকের গাছপালার পাতায় পাতায় চলছে রান্নাবান্নার তোড়জোড়। হাতা-খুন্তি, বাসনকোসন নাড়াচাড়ার শব্দ শোনার জন্যে সে কান পাতে, কিন্তু শুনতে পায় না। তোয়ার কাকু বলেন, "তোর মা, ঠাম্মি রান্নাঘরে আমাদের জন্যে যখন খাবার বানান, কতরকমের শব্দ হয় শুনিসনি? ঠুনঠান, ঘটরঘটর, ছ্যাঁক-তেলতেল ছোঁক-কলকল..."

তোয়া ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। শুনেছে তো। সে সময় কী সুন্দর রান্নার গন্ধও বেরোয়। সেই গন্ধে তো তোয়ার লোভ লাগে, খিদে খিদে পায়।

"একদম সেইরকম রোদ্দুরের আলোর আগুনে গাছের পাতার রান্নাঘরে গাছ তার নিজের জন্যে এবং আমাদের জন্যেও খাবার বানায়।"

"আমাদের জন্যেও!" অবাক হয়ে বড়োবড়ো চোখে তাকিয়েছিল তোয়া। "কই, কোনওদিন দেখিনি তো!"

কাকু আদর করে তোয়ার রেশমি কোমল চুল এলোমেলো করে দিয়ে হেসে বললেন, "ওরা কি আর ভাত-ডাল-তরকারি বানায়? ওরা বানায় চাল, গম, ডাল, সব আনাজ, সবরকম ফল - আম, জাম, লিচু, পেয়ারা।"

একটু থেমে কাকু বলেছিলেন, "আরও কী জানিস, তোয়ারানি, আমাদের রান্নায় যেমন সুন্দর গন্ধ হয়, তেমনি মাঝে মাঝে বেশ ঝাঁঝালো গ্যাসও হয়। সে ঝাঁজে নাক জ্বলে, চোখ জ্বলে, হ্যাঁচ্চো হয়। গাছেদের রান্নায় তেমন কোনওদিন হয় না।"

"তাই?"

"হুঁ। বরং সেই গ্যাসে আমাদের শ্বাস নিতে আরাম হয়। আর সেই গ্যাস বাতাসে যত বেশি থাকে, আমাদের শরীরও তত চাঙ্গা থাকে। শহর থেকে দূরে, যেখানে অনেক গাছপালা, সেখানে তাই জোরে জোরে শ্বাস নিতে হয়। এখন তো তুই ছোট্ট, বড়ো হলে জানবি ওই গ্যাসের নাম অক্সিজেন, আর গাছেদের এই রান্নার নাম সালোকসংশ্লেষ।"

কাকু প্রায়ই বাইরে চলে যায়। দু'তিন মাস পরপর বাড়ি এসে দিন দশেক থাকে। তখন তোয়ার জন্যে কিছুমিছু জিনিস আনেই। আর আনে অনেক অনেক মজার মজার কথা। কাকু ছাড়া তোয়া তখন আর কাউকে চিনতেই পারে না।

সকালবেলা ছাদে উঠলেই তোয়ার কাকুর কথা মনে পড়ে খুব। কাকুর কথামতো বুক ভরে খুব জোরে জোরে শ্বাস নেয়। আজ তার এই শ্বাস নেওয়া দেখে চড়ুই মিচকি মিচকি হাসল। বলল, "ও তোয়াদি, ও তোয়াদি, আর নিও না যেন, বাতাস থেকে ফুরিয়ে যাবে পুরো অক্সিজেন।"

চড়ুইয়ের এই কথায় তোয়া এবং অন্য সবাই হেসে ফেলল কিচিরমিচির করে। শুধু কাক গম্ভীর হয়ে বলল, "গুড মর্নিং তোয়াদিদি, তোমার আদরে না চড়ুইটা খুব ফাজিল হয়েছে। তোমাকেই আর মান্যি করে না।"

হাসতে হাসতে তোয়া বলল, "বাহ্ রে, আমি বুঝি স্কুলের বড়োদিদিমণি? ভয় পেয়ে বলবে আমায়, 'আজ্ঞে দিদি, আপনি?'

তোয়ার কথায় কাক একটু দমে গেল। কিন্তু অন্যেরা বেশ মজা পেল। তোয়া কাককে আবার বলল, "মিষ্টি সুরে বলতে কথা, বলছি কত বল, তুই শুধুই খুঁজিস দেখি ফাঁকি দেওয়ার ছল।"

কাকটা আরও অপ্রস্তুত হয়ে একবার ঠোঁট আর একবার ঘাড় চুলকোল। তারপর বলল, "কা কা করি, খা খা করি, তার তো থাকে মানে, কাক ডেকেছে মিষ্টিসুরে, এমন কি কেউ জানে?"

কাকের এই কথা শুনে তোয়া হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল খুব। আর অন্য পাখিরাও ডানা ঝাপটে ঝটপট বলে উঠল, "কাকদাদা গো কাকদাদা, তুমিই হলে সেরা, তোমার কথার সুরটি যেন মিষ্টি মধু ঘেরা।"

কথাগুলো বলে ফেলে কাক একটু লজ্জা পাচ্ছিল। কি জানি কী বলে ফেললাম! এখন সকলের প্রশংসায় একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "তোয়াদিদির ক্লাশে পড়ে শিখছি কত কী যে, কাকের গলায় মিঠে সুর, শুনছি এখন নিজে!"

তোয়া হাসতে হাসতে বলল, "তোদের মতো মিষ্টি ডানা থাকত যদি মোর, ফুড়ুৎ করে উড়ে যেতাম একটু হলেই ভোর। এদিক সেদিক ঘুরে এসে খেতাম মায়ের বকুনি, বইয়ে ভরা ব্যাগটি পিঠে স্কুল ছুটতাম তখুনি। যা কিছু সব বইয়ে পড়ি দিদিমণির কাছে, উড়ে উড়ে দেখে নিতাম কোনটা কোথায় আছে। সেই কবে তুই খেয়েছিলি কাদের ক্ষেতের ধান, বুলবুলি তোর ঘুচলো না দেখ আজও সে বদনাম। কে যেন সে কত আগে দেয়নি বুঝি খাজনা, তোর কথাতেই মানুষগুলো আজও বাজায় বাজনা।"

বুলবুলি খুব দুঃখী দুঃখী মুখ করে বলল, "ওসব কথায় দিই না গো কান, তোয়াদিদি বুঝলে, বুলবুলি-ঝাঁক পাবে না আর ধানের ক্ষেতে খুঁজলে। এখনও তাও উড়ে বেড়াই, দু-চারটে বুলবুল, কবে কখন হারিয়ে যাব, আর পাবেই না বিলকুল।"

তোয়াদিদি বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে বলল, "সত্যি, এমন যদি হয়, মনে ভীষণ লাগে ভয়। আমরা আছি, গাছও আছে, নেই শুধু হায় পাখি, আমাদেরও জীবন দেখিস রইবে আধেক বাকি। সকালবেলার ঘুমটি ভাঙে তোদের ডাকটি শুনে, দুপুরবেলা ঘুম এসে যায় ঘুঘুর সুরের গুণে। নিরিবিলি একলা বনেও, সঙ্গী থাকিস তোরা। তোদের পিছু ঘুরে ঘুরে সময় কাটাই মোরা।"

তোয়াদিদির এই কথায় টিয়া বলল, "তুমি ছাড়া তেমন কেউ দেখেই না গো মোদের। ব্যাটারি দেওয়া খেলনা-পাখি আছে দেখি ওদের! সে পাখিরা দেখতে যেন, আমরা অবিকল। ঘন ঘন ডিগবাজি খায়, বাপরে কী ধকল! তাদের মধ্যে কেউ কেউ শুনি সুরে বলে ছড়া, হামটি-ডামটি, জ্যাক অ্যান্ড জিল যেমন তোমার পড়া।"

তোয়াদিদি খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'ধুর ধুর। ওসব দেখে মজা পায় পুঁচকি ছেলেমেয়ে। একটুখানি বড়ো হলেই, কেউ দেখেও না আর চেয়ে। কলের পুতুল হাতে নিয়ে, ক'দিন চমক লাগে ঠিকই। কিন্তু রোজই আমি অবাক হই, যত্তো তোদের দেখি।"

"সে তো তুমি, আমাদের ভালোবাস বড়োই, রোজই তুমি আমাদের আদর যত্ন করোই। গরমকালে কোথাও যখন, পাই না খাবার জল। আমরা বলি, সবাই মিলে তোয়ার বাড়ি চল। তোমার গামলাভরা জলে, আমরা আসি দলে দলে। তোমার ওই জলেই আমরা সবাই মেটাই তৃষ্ণা। কিন্তু ওই কাক, যত বলি, অমন করিস না! শুনবে না, নেয়ে খেয়ে জলটাকে করে তুলবেই ঘোলা।"

তোয়াদিদি হাসতে হাসতে বলল, "কাকের তো নেই কান, থাকলে দিতাম কানমোলা।"

কাক ঠোঁট আর ঘাড় চুলকে একটু মিচকে হাসল। বলল, "গরমকালে নোংরা খেয়ে, আনচান করে গা। তোমার রাখা জল দেখে তাই থাকতে পারি না। গামলার জলে কাকচান সেরে বড্ড আরাম পাই, তোয়াদিদি গো, আমার'পরে রাগ করতে নাই।"

কাকের কথায় তোয়া দুলে দুলে খুব হাসতে লাগল। অন্য পাখিরাও কিচিরমিচিরে ভরে তুলল চারদিক। তোয়া বলল, "রাগ করিনি মোটেই আমি, দুষ্টুসোনা কাক, আজ থেকে নয় তোর জন্যে এক উপায় করা যাক। আরেকখান গামলা এনে রাখব ভরে জল, তখন যেন করিস না আর নতুন কোন ছল।"

চড়াই, শালিক, পায়রা, বুলবুলি, টিয়া সবাই এই ব্যবস্থায় খুব খুশি হল। বলল, "তোয়াদিদি, বেশ হবে, মজা হবে, এমন যদি হয়, তেষ্টা পেয়ে কষ্ট তবে হবার কথা নয়।"

কাকের সর্বদাই খিদে পায়। সে যেমন কা কা করে, তেমনি খা খা করে। ভোর থেকে উঠে নোংরা ঘেঁটে, আবর্জনা ঘেঁটে খেয়েছে কিছু মন্দ না। কিন্তু তাও তার আর তর সইছিল না। খিদেয় উড়ুউড়ু করছিল। ঠোঁট ফাঁক করে দু'বার খা খা ডেকে বলল, "তোয়াদিদি, তোয়াদিদি এবার আমি উড়ব, কোনখানে কী খাবার পাই সন্ধানে তার ঘুরব।"

তোয়াদিদি কাকের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা, দুষ্টুসোনা কাক, এখন উড়েই তবে যাক। আমারও নিচের থেকে পড়বে এবার ডাক। আমাদের গল্পগাছা এই অব্দিই থাক। বিকেলবেলা আসিস সবাই একটু পেলে ফাঁক।"

টিয়া বলল, "ঠিক বলেছ, তোয়াদিদি, সময় হল যাবার, বাসায় আছে বাচ্চাদুটো তাদের জন্যে খাবার, যোগাড় করে নিয়ে যাব ঘুরে বাদাড়বন, বিকেলবেলা ফেরার পথে কথা বলব অনেকক্ষণ।"

কাক উড়ে গেল বাজারের দিকে, যেখানে অনেক নোংরা আর আবর্জনা জমা হয়। আর টিয়া উড়ে গেল সামনের বিরাট বাগানের দিকে। ওদের উড়ে যাওয়া দেখতে দেখতে অন্য পাখিরা বলল, "তোয়াদিদি তুমিও এবার নিচেয় চলে যাও, মুখটুখ ধুয়ে, চটপট করে খাবার খেয়ে নাও। তারপরে তো বসবে খুলে এত্তো এত্তো বই! দুপুর অব্দি তুমি আর সময় পাবে কই? আমরা যে ক'জন থাকি তোমার আশেপাশে, পড়ার ঘরের জানালায় বসি ঘুরে ঘুরে এসে। তোমার দিকে চোখ রেখে কষ্ট যে পাই খুব, লেখায় পড়ায়, নাচে গানে, তোমার ছ'টা দিনই ডুব।"

চড়াই, শালিক, পায়রা বুলবুলি সবাই উড়ে গেল হুশ করে। ওদের উড়ে যাওয়া ডানার দিকে তাকিয়ে তোয়া একটু হাসল। তারপর নিজের মনেই বলল, "রবিবারেই মেলে আমার বেশ কিছুটা ছুটি, তোদের কথা শুনতে তাই ভোরবেলাতেই উঠি। তোদের ডানায় পাই রে আমি মুক্ত আকাশ নীল। নিবিড় সবুজ গাছে ঘেরা শান্ত গভীর ঝিল। বদ্ধ মনে ভাসিয়ে আনিস সতেজ মুক্ত হাওয়া। ওইটুকুতেই পাখির ঝাঁক, আমার অনেক কিছু পাওয়া!"

———

অলঙ্করণঃ সুজাতা চ্যাটার্জী

কুতুয়া

প্রকল্প ভট্টাচার্য

"ক্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ!"

কলিংবেল বাজতে মা এসে দরজা খুলে দিল। ঢুকতে ঢুকতে বুলান বলল, "আচ্ছা মা, সকলের বাড়ির কলিংবেল কী সুন্দর মিউজিক্যাল। আমাদেরটাই শুধু এমন কেন?"

মা শরবতের গ্লাস বাড়িয়ে দিতে দিতে গম্ভীরমুখে বুলানকে আপাদমস্তক জরিপ করে বলল, "যে কাজের জন্য যেটা। কলিংবেলের কাজ লোককে ডেকে দেওয়া। মিউজিক শোনাবার জন্য অডিও সিস্টেম আছে। তোমার আসতে যেন একটু দেরি হল আজ?"

বুলান সতর্ক হল। মায়ের মুডটা বোঝা যাচ্ছে না। বেশি নয়, মিনিট পনেরোই দেরি হয়েছে। কিন্তু কারণটা মাকে কিছুতেই বলা যাবে না। তার চেয়ে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেওয়া ভাল।

"জান মা, আমাদের স্কুলের সায়েন্স এক্সিবিশনের জন্যে আমাদের ক্লাশ থেকে আমাকে সিলেক্ট করেছে!"

"হ্যাঁ, কালও তো বললে এই কথাটা। খুব ভালো। কিন্তু তার এখনও অনেক দেরি আছে। দেখি, মিস কী কী হোমওয়ার্ক দিলেন আজ?"

মুখ হাত ধুয়ে পোশাক বদলে বুলান দুধ-কর্নফ্লেক্স খেতে খেতে নেক্সট দিনের জন্য স্কুলের ব্যাগ গোছাতে বসল।আবার মা ঘরে এসে ঢোকে, "বুলান, তোমার প্যান্টের পকেটে এগুলো কী?"

বুলানের বুকটা ধড়াস করে ওঠে।

"ক্কী, মা!"

"বিস্কিটের গুঁড়ো মনে হচ্ছে। পকেটে এল কী করে?"

"আজ লাঞ্চটাইমে, মানে ওই শৌভিক দিল... তখন খেলছিলাম তো গ্রাউণ্ডে, তাই পকেটে..."

"কতবার বলেছি, কেউ কিছু দিলেই হ্যাংলার মতো নিয়ে নেবে না! কেন নিয়েছ শৌভিকের বিস্কিট? তোমাকে আমরা বিস্কিট কিনে দিই না?"

"হ্যাঁ মা, আমি নিতে চাইনি। ওর বার্থ ডে, তাই সকলকেই... আর নোব না মা!"

কথা না বাড়িয়ে মা ওয়াশিং মেশিনের কাছে চলে গেল। বুলান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। উফফ্, আর একটু হলেই ধরা পড়ে গেছিল আর কি! আরও সাবধান হতে হবে তাকে।

বুলানের মা একটা হাইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস। খুব কড়া। নাইন টেন-এর ছেলেরা মায়ের সামনে নাকি ভয়ে কাঁপে, বুলান শুনেছে। তাই মায়ের খুব সুনাম। টিচার হিসেবেও মায়ের খুব নামডাক। কিন্তু মা টিউশন পড়ায় না কারোকে। স্কুল শেষ হলেই সোজা বাড়ি চলে আসে বুলান ফেরবার একটু আগে। বলে, "আমার ফ্যামিলি আমার কাছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি। পড়ানো আমার প্যাশন, কিন্তু সেটা সেকেণ্ডারি।"

সত্যি বলতে কী, বুলানের মনে হয় যে তার বাবাও বোধহয় মাকে একটু সমঝে চলে। একবার তার হয়ে বলতেও গেছিল, "ওহ্ ঝুমা, বুলানের ব্যাপারে তুমি বড্ড বেশি স্ট্রিক্ট হয়ে যাচ্ছ দিন দিন! আফটার অল, হি ইজ আ চাইল্ড!"

মা ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, "আমি জানি, হি ইজ আ চাইল্ড। এও জানি, কোন ব্যাপারে কখন কতটা স্ট্রিক্ট হতে হয়। ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফো, চাইল্ড সাইকোলজি আমার স্পেশাল পেপার ছিল। এই বয়সে ওর ফার্ম পেরেন্টিংই দরকার। শ্লোকটা স্মরণ কর, লালয়েত পঞ্চবর্ষাণি, দশবর্ষাণি তাড়য়েত। বুলানের বয়স এখন দশ বছর। অ্যানাদার ফাইভ ইয়ার্স। তারপর তুমি তোমার ছেলে সামলিও, আই ওন্ট বদার!"

বেচারা বাবা। সেই সকালে অফিসে বেরোয়, ফিরতে রাত্তির হয়ে যায়। বাড়িতেও ল্যাপ্টপ আর ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এর ওপর যদি বুলানের হোমটাস্ক, প্রজেক্ট এইসব দেখতে হত, সত্যিই পাগল হয়ে যেত। তাই তারপর থেকে মাকে আর ঘাঁটায় না।

আজ বুলানের এমন অবস্থা, উত্তেজনাও হচ্ছে অথচ খুলে বলতেও পারছে না কারোকে। কোনওভাবে বাবা আজ অফিস থেকে ফেরা পর্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে। কিন্তু বাবাও কি সল্যুশন দিতে পারবে কোনও? দেখা যাক।

"মা, আজ কোনও টাস্ক দেয়নি স্কুলে।" স্কুলের বইখাতা গুছিয়ে বুলান বলল, "আমি কি একটু নিচে বেড়াতে যাব?"

মা ভুরু কোঁচকাল।

"হঠাৎ নিচে যেতে চাইছ যে? এখন তো তোমার টিভিতে কার্টুন দেখবার সময়!"

ঠিক। আবার মনে মনে জিভ কাটল বুলান। বিকেলের একঘন্টা সময় তার টিভি দেখবার জন্যই বরাদ্দ। কতবার মা-ই তাকে বলেছে নিচে গিয়ে সাইকেল চালাতে, খেলতে। কিন্তু বুলান নিজেই কান্নাকাটি করে এই টিভি দেখবার সময়টা আদায় করেছে। এই হাউসিং কমপ্লেক্সে তার খেলার কোনও সঙ্গী নেই, একা একা সাইকেল চালাতে ভালো লাগে না, এইসব বলে।

কিন্তু এখন তো তাকে একবার নিচে যেতেই হবে। মাকে সেটা বলবে কী করে! ম্যানেজ দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি বলল, "রোজ টিভি দেখতে ভালো লাগে না মা। একা একাই একটু খেলে আসি, তারপর পড়তে বসব।"

যতটা সম্ভব স্বাভাবিক মুখ করে বুলান নিচে নামল। ওয়াচম্যান আঙ্কল আবার মাঝে মাঝে রাউন্ড দেয়। দেখলেই মাকে গিয়ে লাগাবে। যাক, এখন কেউ নেই। বুলান আস্তে আস্তে তাদের কমপ্লেক্সের পেছনের গেটের বাইরে চলে এল। এইদিকে বিশেষ কেউ আসে না। বাইরে বেরোলেই পাশের প্লটে ফ্ল্যাটবাড়ি বানানো হচ্ছে। তাই রাবিশ জমা হয়ে আছে কিছু। চাপাস্বরে 'কুতুয়া!' বলে ডাকতেই সেই রাবিশের ঢিপির পেছন থেকে একটা নেড়ি কুকুরের ছানা লেজ নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে এল।

গায়ের রঙ খয়েরি আর কালোয় মেশান, রোগা। কিন্তু চোখদুটো খুব উজ্জ্বল। আজই সকালে স্কুল যাওয়ার সময় ভ্যানটা এই গেটে এসেছিল। তাই বুলানের নজর পড়েছিল। তখন একদম সময় ছিল না। সারাদিন এর কথাই ভেবেছে, একটা নামও ঠিক করেছে, 'কুতুয়া'। স্কুলে শৌভিকের দেওয়া বিস্কিটটা পকেটে করে এনেছিল এরই জন্যে। শৌভিকও জানে বুলানের মা খুব স্ট্রিক্ট। তাই সব ঘটনা শুনে জানতে চেয়েছিল, "পুষবি ভাবছিস, তো আন্টি অ্যালাও করবেন রে?"

"জানি না। বাবাকে একবার রিকোয়েস্ট করব। নাহলে রোজ বিকেলে নিচে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা করে যাব।"

স্কুল থেকে ফিরে পেছনের গেটে এসে পকেটের বিস্কিট কুতুয়াকে খাইয়ে তবে শান্তি। কিন্তু ওদিকে তাড়া। একটু দেরি হলে মা ভ্যান আঙ্কলকে ফোন করবে। আর যদি জানতে পারে যে বুলান নেমেছে অথচ বাড়ি ঢোকেনি...

যাই হোক, এখনও পর্যন্ত সব তো ভালোয় ভালোয় কাটছে। দেখা যাক, বাবা কিছু উপায় বার করতে পারে কি না। কুতুয়াকে দেখে বুলানের এতক্ষণের দুশ্চিন্তা আর ভয় সব কেটে গেল। মাটিতে উবু হয়ে বসে মনের আনন্দে সে গল্প করতে লাগল কুতুয়ার সঙ্গে।

"শোন, তোর নাম রেখেছি কুতুয়া। কুতুয়া বলে ডাকলে সাড়া দিবি, কেমন? আমার নাম বুলান। আমি তোর বন্ধু। স্কুল থেকে তোর জন্যে যে বিস্কুটটা নিয়ে এলাম, খেয়েছিস? ভালো ছিল?"

কুতুয়া বুলানের মুখের দিকে তাকায় আর লেজ নাড়ে।

"আবার খিদে পাচ্ছে? কিন্তু এখন তো কিছু খাবার আনিনি রে!"

কুতুয়া লেজ নেড়েই চলে।

"শোন, আমায় এবার পড়তে বসতে হবে। যদি রাতে একটু রুটি লুকিয়ে আনতে পারি, তো তোকে দেব। তুই কিন্তু ঘুমোবি না, কেমন? এখানেই থাকবি। আসব আমি আবার। আর..."

বুলানের বাকি কথা আর বলা হল না। কারণ, সে দেখতে পেল ঠিক পেছনেই তার মা দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো এতক্ষণ যা যা বলেছে, সবই শুনেছে। স্থির চোখে মা তাকিয়ে আছে বুলানের দিকে। আর বুলান যেন স্ট্যাচু। কতক্ষণ এইভাবে কেটেছে কে জানে। হঠাৎ কুতুয়া কী মনে করে সোজা এগিয়ে গিয়ে বুলানের মায়ের পায়ের কাছে গিয়ে 'কুঁইকুঁই' করতে লাগল আর লেজ নাড়াতে লাগল। মা গম্ভীর গলায় বলল, "বুলান!"

বুলান নিশ্চিত, হাইড্রোজেন বোমা ফাটবে এবার। সে ভয়ে চোখ বুজিয়ে, কান বন্ধ করে ফেলতে যাচ্ছিল। কিন্তু...

কিন্তু মা বলল, "এই নোংরার মধ্যে পড়ে থাকলে তো তোমার কুতুয়ার অসুখ করবে! একটা বাকেটে একটু গরম জল, তার সঙ্গে ডেটলের শিশি আর তুলোর প্যাকেটটা নিয়ে এস। আর হ্যাঁ, আলমারির নিচের তাকে দেখবে পুরনো টাওয়েল কেচে রাখা আছে, একটা আনবে। দৌড়ে নিয়ে এস। একে পরিষ্কার করে তবে ঘরে নিয়ে যাব। কাল একবার একজন ভেট আঙ্কলকে দেখিয়ে নেব। তবে অন ওয়ান কণ্ডিশন, তুমিই কিন্তু এর সমস্ত দায়িত্ব নেবে। পারবে তো?"

আনন্দে, বিস্ময়ে বুলানের গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছিল না। তবুও কোনওমতে বলল, "পারব মা, শ্যিওর!"

বলেই জল-টাওয়েল আনতে ছুট লাগাল।

যদি একবার পেছন ফিরে দেখত, তাহলে আরও অবাক হত। দেখত, তার হেডমিস্ট্রেস, কড়া শাসন করা মা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে কুতুয়ার মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর কুতুয়া মহানন্দে কুঁই কুঁই করে লেজ নাড়াচ্ছে!

অলঙ্করণঃ মানস পাল

গল্পঃ সাবধানে যাবেন - সৈকতা দাশ

“যত সমস্যা সব আমারই জন্যে তৈরি থাকে। সত্যিই ভাগ্যটা বড়ো খারাপ। মাঝরাস্তায় আজকেই বাসটা খারাপ হতে হল! এখন এতখানি রাস্তা, একা যেতে হবে। রাস্তায় তো কাউকে দেখতেও পাচ্ছি না!” গজগজ করতে করতে রাস্তায় হাঁটছিল সহেলী।

আসলে এমনিতেই আজ অফিসে প্রচুর চাপ ছিল। তারপরে আবার মাঝরাস্তায় বাস খারাপ। তবুও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। আর তাতেই বিপত্তি বাড়ল। পরের বাসস্টপ অনেকটা রাস্তা। বাধ্য হয়ে ঘুরপথ ধরেছিল সহেলী। বাসের কন্ডাক্টার আর ড্রাইভারদাদা বারবার ওকে বারণ করেছিল, "ম্যাডামজী, ওই রাস্তায় যাবেন না। মৃত্যু ওৎ পেতে থাকে।"

স্বভাবতই ও শোনেনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বড্ড ভুল করেছে। দু'ধারে ঘন জঙ্গল হয়ে আছে রাস্তার। একটা লোককেও দেখতে পাচ্ছে না। শুধু মোবাইলের আলোয় যেটুকু যা আলো। দূরে চাপ চাপ অন্ধকার। অন্য সময় এই অন্ধকার ভালোবাসলেও আজ কীরকম যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে সহেলীর। ভূতে না ভয় পেলেও আজকালকার মানুষ, সত্যিই ভূতের চেয়েও ভয়ংকর!

এসবই ভাবতে ভাবতে এগিয়ে যাচ্ছিল ও। হঠাৎ পেছনে পায়ের আওয়াজে চমকে উঠল। কেউ কি আসছে?পেছনদিকে মোবাইলের আলোটা ফেলল সহেলী। আরে, ওই তো একজন আসছে মনে হয়! হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন। কাছে আসতে দেখল এক বয়স্ক ভদ্রলোক। মাথার চুলগুলো পুরো সাদা হয়ে গেছে। হাতে লাঠি, কুঁজো হয়ে হাঁটেন।

"আরে, আপনিও কি ওই বাসে ছিলেন? কতক্ষণ ধরে একা হেঁটে চলেছি। আর পাঁচ মিনিটের রাস্তা অবশ্য। তবুও ভালো আপনার দেখা পেলাম। সত্যি বলতে কী, বেশ ভয় ভয় করছিল এতক্ষণ।"

একটানা কথাগুলো বলে থামল সহেলী। আসলে এতটা সময় একা হাঁটতে হাঁটতে বেশ ভয় পাচ্ছিল। তাই একজনকে পেয়ে গড়গড় করে কথা বলতে শুরু করে দিল। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল, যার উদ্দেশ্যে এতগুলো কথা বলা,তিনি শুধু অবাক হয়ে একবার তাকালেন সহেলীর দিকে। অথচ কোনও কথাই বললেন না। কিন্তু সহেলী তো চুপ করে থাকার মেয়ে নয়। চেনা অচেনা নির্বিশেষে সে অবিরাম বকে যেতে পারে। সে বলেই চলেছে, "কী সমস্যা বলুন তো! এভাবে মাঝরাস্তায় বাস খারাপ হল। একটা গাড়িও দাঁড়াচ্ছিল না। সবাই বড়ো স্বার্থপর। আসলে বড়ো রাস্তায় অনেকটা হাঁটতে হত। তাই এই রাস্তাটা ধরলাম। একটাও লোক নেই কেন বলুন তো? আর কী অন্ধকার! আরে এই তো, বাসস্টপ চলেই এল। আচ্ছা আপনি কী রোজ যাতায়াত করেন এই রাস্তায়? আসলে আপনার হাতে আলো নেই তো। এই অন্ধকারে হাঁটতেন কী করে?"

আরও হয়তো কিছু বলত সহেলী। তার আগেই ওপাশ থেকে গমগমে গলায় ভেসে এল, "আপনার বাসস্টপ তো এসে গেল। কিন্তু আপনি হয়তো আমায় দেখে ভালো করলেন না। আমায় সবাই দেখতে পায় না। আর যারা দেখে তারা বাঁচে না। সাবধানে ফিরবেন। আমি চলি।"

অন্ধকারে আবার উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছেন ভদ্রলোক। প্রথমে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ভদ্রলোকের যাওয়ার দিকে। তারপরেই খুব একচোট হেসে নিল সহেলী। উফ্! এতক্ষণ ধরে কি ও এক মাতালের সাথে বকতে বকতে আসছিল! সত্যিই, এটা ওর দ্বারাই সম্ভব। বন্ধুরা এ নিয়ে অনেক হাসাহাসিও করে। আসলে কথা না বলতে পারলে ওর কীরকম পাগল পাগল লাগে নিজেকে। অবশ্য কতটা সুস্থ ও তা নিয়ে সবার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু ওনাকে তো মাতাল বলে মনেই হয়নি। কথাও তো বলছিলেন না।

কীসব বলে গেল! নিজের মনেই হাসতে হাসতে রাস্তা পেরোচ্ছিল ও। ওপারে যেতে গিয়েই চমকে উঠল। পেছন থেকে কে যেন ডাকছে মনে হচ্ছে। এখানে আবার কে ডাকছে ভেবে মুখটা ফেরাতেই অবাক হয়ে গেল সহেলী। সূর্য না?হ্যাঁ, সূর্যই তো! তবে যে...!

না, আর কিছু ভাবার আগেই সূর্য এগিয়ে এল ওর দিকে। "কী রে, কেমন আছিস? এই রাস্তা দিয়ে এলি? জানিস নারাস্তাটা ভালো নয়?"

সহেলী বলল, "তুইও একথা বলছিস! এই তুই বিজ্ঞানের ছাত্র!"

"ছিলাম।" মৃদু হেসে বলল সূর্য।

"ছিলিস মানে! এখন কি কবিতা লিখিস? নেশাটা আছে এখনও?" সহেলী জিজ্ঞেস করল।

কলেজের বন্ধু ওরা। সূর্য ছিল লেখাপড়ায় দুর্দান্ত। কিন্তু সারাদিন কবিতা লিখে বেড়াত। এই নিয়ে নাকি ওর বাড়িতেও খুব অশান্তি হত। কলেজ শেষ, যে যার মতো ছিটকে পড়েছিল। তবে সহেলী শুনেছিল, সূর্য নাকি খুব আশ্চর্যজনকভাবে মারা গিয়েছে।

উফ্, কত ভুল খবর! ভাগ্যিস ভূত বলে আঁতকে উঠিনি! নিজের মনেই হেসে উঠল সহেলী।

"কী ভাবছিস? আমি ভূত?"

"না মানে, যে খবরটা শুনেছিলাম..." আমতা আমতা করে বলল সহেলী।

"ধুস্! পালিয়েছিলাম বাড়ি থেকে। চ, তোকে বাসে তুলে দিই।"

"কী করছিস আজকাল?" সহেলী জিজ্ঞেস করল।

"ডাক দিয়ে বেড়াই।"

"মানে?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সহেলী।

হা হা করে হেসে উঠল সূর্য। "বুঝবি না, চ।"

ওপারে গিয়ে তো আর এক কান্ড। এক্ষুনি নাকি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। রক্তে ভাসছে চারদিক। রক্ত দেখেই চোখ বন্ধ করে ফেলেছে সহেলী। কোনওরকমে চোখ বন্ধ করে বাকি রাস্তাটুকু পেরলো। সবাই বলছে একটা মেয়েকে লরি থেঁতলে দিয়ে চলে গিয়েছে।

সহেলী একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। এমনিই এত রক্ত দেখে শরীরটা খারাপ লাগছে। আজ আদৌ বাড়ি যাওয়া হবে! এক্ষুনি তো রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। ওই একটা বাস আসছে। যাক। থামতেই সূর্যকে বিদায় জানিয়ে উঠে পড়ল ও। কিন্তু আসার সময় মেয়েটির পা চোখে পড়েছিল। জুতোদুটো বড্ড চেনা চেনা লাগছিল। কোথায় যে দেখেছি, কোথায় যে দেখেছি! উফ্! আজ যে কী হচ্ছে! কিছুতেই মনে করতে পারছিল না সহেলী। তাহলে কি ওরই কোনও বন্ধু? ইসস্, স্বার্থপরের মতো ও চলে এল! কিন্তু কে? না, না, তা যেন না হয়! ভাড়া দিতে গিয়েই চমকে উঠল। মেরুদন্ড বেয়ে বরফের স্রোত নেমে গেল সহেলীর। মনে পড়ে গিয়েছে জুতোজোড়া কোথায় দেখেছে। দু'বছর আগে মেলা থেকে ও আর ওর বোন কুহেলী বাবার কাছে বায়না করে একই জুতো কিনেছিল। সহেলী আর কুহেলী দুই বোন, যমজ। মাও গুলিয়ে ফেলে ওদের। তাহলে কি...মৃত্যুও ভুল করল? কাকে ডাকতে এসেছিল সূর্য? হিসেবগুলো মেলানোর আগেই জ্ঞান হারাল সহেলী।

অলঙ্করণঃ পুণ্ডরীক গুপ্ত

কমিকসঃ ভেন্ট্রিলোকুইস্ট - বিনয় পাল

ভেন্ট্রিলোকুইস্ট

বিনয় পাল

দর্শকের কাছে
ভেনট্রিলোকুইজম
কি আজ এতই একঘেয়ে?
মনে হচ্ছে এই পিকুই দর্শকের মনে
বোরিং হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ দশ বছর একই মডেলের
পিকুকে দেখতে দেখতে মানুষ আজ হাঁফিয়ে উঠেছে।
এই আস্তাকুঁড়েটাকে বাইরে
ছুঁড়ে ফেলে দিলে কেমন হয়,
ওর জন্যই তো আমার আজ
এই অবনতি।
মুহূর্তের রাগে দিশাহারা হয়ে গেল
বিমল লাহিড়ী।
তোর আর আজ কোনও
প্রয়োজন নেই।তুই দর্শকের
কাছে অপ্রিয়।
দূর হ !!
নরকের কীট

এবার আধুনিক কোনও মডেলের পুতুল তৈরী করতে হবে।
জায়গাটা কেমন যেন অদ্ভুত আর গা ছমছমে ।
আজকের রাতটা অন্যদিনের তুলনায় কেমন যেন আলাদা লাগছে ।
যাক প্রায় বাড়ি পৌঁছে গেছি।
বাড়িতে পৌঁছে
বাবু আপনি এসে গেছেন? খাবার তৈরী আছে।
আমি একটু পরে খাব। তুই খাবার টেবিলে রেখে চলে যা।
৩

না, অনেক রাত হল এবার খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়া যাক
পিকুর জন্য সত্যিই মন খারাপ লাগছে, ওকে নিয়েই তো আমার ভেন্ট্রিলোকুইস্ট জীবনের শুরু, দীর্ঘ দশ বছরের সাথী, রাগের মাথায়.....না পিকুকে মন থেকে মুছে ফেলতেই হবে। পরশু একটা শো আছে। কালই বানিয়ে ফেলতে নতুন একটা পুতুল। এবার শুয়ে পড়ি। শুভরাত্রি।
পরেরদিন
সব জিনিসপত্রই আনা হয়েছে। এবার শুধু বানিয়ে ফেলার অপেক্ষা
দেখতে মোটামুটি ঠিকই আছে।তবে দেহের আয়তন পিকুর তুলনায় ছোট করতে হবে।
আশা করি কালকের শো ভালো হবে, নতুন কিছু মজার সংলাপও এবার লিখে ফেলতে হবে, সঙ্গে গাব্বুর গলার আওয়াজটা আরও সরু ও মজার করে রপ্ত করতে হবে|
বাহ্! এই তো তৈরী আমার নতুন সঙ্গী , এর নাম দিলাম গাব্বু|
৪

পরের দিন সকালে
একি ভয়ংকর অবস্থা !!! এই নৃশংস কাজ কে করল?
হায় ভগবান! পুতুলটার উপর যেন সমস্ত রাগ কেউ নিংড়ে দিয়েছে।
কী আশ্চর্য! কাল রাতে এই ঘরে কে এল? সব দরজা জানালা তো বন্ধ ছিল, আমার কাজের লোক শিবুও তো রাতে থাকে না,হয়তো কোনও বিড়ালে কাজ হবে
এই পায়ের ছাপগুলো কার? ঠিক যেন কোনও ছোটো শিশুর।
আজকের শো বাতিল করা ছাড়া আর উপায় নেই। এটাকে মেরামত করার মতো অবস্থায় নেই, নতুন করেই আবার তৈরী করতে হবে।কয়েকদিন পরেই আমাকে আরেকটা বড়ো প্রদর্শনীতে যেতে হবে।

এই প্রথম পুতুলের অভাবে কোনও শো বাতিল হল, একেই বলে দুঃসময়... যাক আবার তৈরী করে ফেলেছি
চেহারায় বেশ একটা বাঙালি ছাঁপ আছে।এর নাম 'বাঙালিবাবু' রাখাই শ্রেয়।
গভীর রাত্রে
একি, এ কীসের আওয়াজ? পাশের ঘর থেকেই তো এল মনে হল
মনে হচ্ছে কোনও হিংস্র গজরানি
কোনো কোনও পশু হতে পারে, পিস্তল সঙ্গে নিয়েই যাওয়া যাক।
৬

ঈঈঈ!!!
এযে অবিশ্বাস্য ! আমি স্বপ্ন দেখছি না তো ?
এযে স্বয়ং পিকু! আমার হাতের তৈরী পুতুল জীবন্ত হয়ে উঠেছে ।

পিকুর বীভৎস রূপ
দেখে মনে হয় ,এই
পিকু যেন নরক থেকে
উঠে এসেছে
পিকু প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে
নষ্ট করছে আমার তৈরী পুতুল।
হায় ভগবান !এও কি সম্ভব?
পিকু নৃশংসভাবে নষ্ট
করে চলেছে তার
প্রতিদ্বন্দ্বীকে
কিন্তু কিছু বোঝার
আগেই
জীবন্ত পিকু ঝাঁপিয়ে
পড়ল বিমল
লাহিড়ীর উপর
মুহূর্তে গর্জে উঠল
বিমল লাহিড়ীর পিস্তল
৮

আআআআআআ...
পিস্তলের গুলি পিকুর শরীর ভেদ করে চলে গেল, আর শোনা গেল পিকুর বীভৎস চিৎকার
পরমুহূর্তেই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন বিমল লাহিড়ী।
পরদিন তার কাজের লোক শিবুই বিমলবাবুর জ্ঞান ফেরায়। কিন্তু এর সাথে সাথেই মেঝেতে কয়েক জায়গায় শুকনো রক্তের দাগ আবিষ্কার করেন... অবশ্য এই রক্তের দাগের উৎস যে কী তা বিমলবাবুর বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না
এমন ঘটনা কোনও ভেন্ট্রিলোকুইস্টের জীবনে হয়তো ঘটেনি, কখনও অতিরিক্ত ভালোবাসা কোনও জড় পদার্থের মধ্যেও কি প্রান সৃষ্টি করতে পারে কিংবা কখনও তাকে তৈরী করতে পারে প্রতিহিংসা পরায়ণ রূপে ?? এই প্রশ্নের উত্তর আজও পাইনি

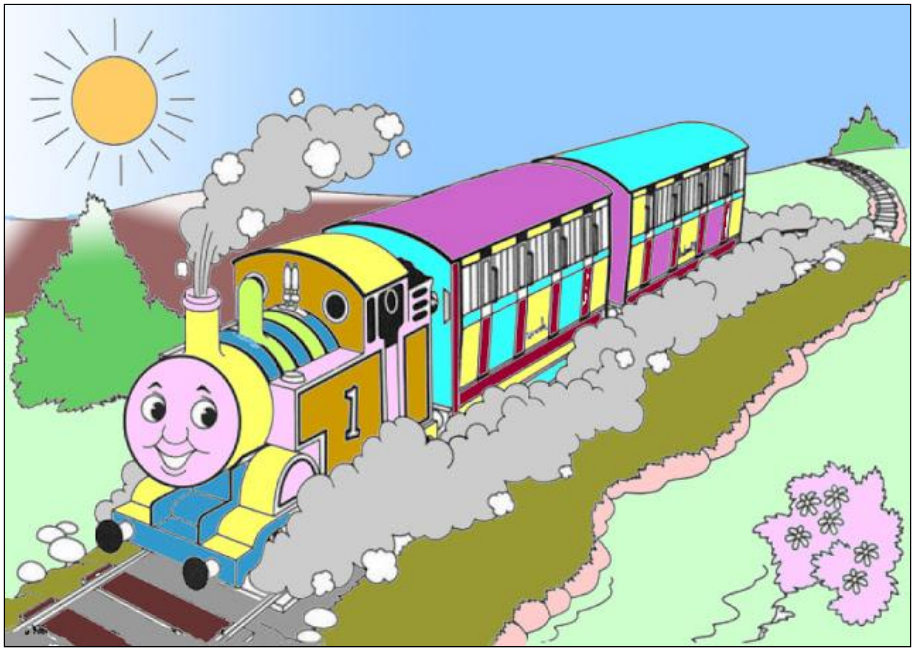

আসলি মজা

মধুমিতা ভট্টাচার্য

পুকুর-পাকুর, পুকুর-পাকুর
চলছে রেলের গাড়ি,
দল বেঁধেছি দিচ্ছি হানা
দূরের বন্ধু-বাড়ি।
তেঁতুলপাতায় ন'জন থাকে
বন্ধুর বাড়ি ক'জন?
আসলি মজা সবার সাথে
সবাই যখন স্বজন।
ঝুকুর-ঝাকুর, টুকুর-টাকুর
রেল চলেছে দিনরাত,
দু'পাশে ক্ষেত, ঝোপ-জঙ্গল
করছে না তো দৃকপাত!
সূয্যি যখন রোশনি ছড়ায়
দিগন্ত অবধি,
তক্ষুনি রেল ঝম-ঝমা-ঝম
পেরোল এক নদী।
যায় ইঞ্জিন ঘটাং ঘটাং
কু ঝিক ঝিক বলে,
তেপান্তরের মাঠ পাড়ি দেয়
কয়লা ভরা কলে।
আকাশপানে ভসভসিয়ে
মেলছে ধোঁয়ার ডানা,
বন্ধু-বাড়ি রেলগাড়িটার
নিশানা ঠিকানা।
আসলি মজা সবার সাথে
সবাই মানে ক'জন?
আমরা যারা গলাগলি
সই-বাগানের স্বজন।
ইকির-মিকির, ফন্দি-ফিকির

চেকারকাকু ধরবে,
টিকিট দেখে মুচকি হেসে
ঘ্যাঁচ করে সই করবে।
“চললে কোথায়,” বললে সবাই
হেসেই লুটোপুটি,
রেল কামরার জানালা গলে
আলোর ছুটোছুটি।
পাকুর-পুকুর, পাকুর-পুকুর
আমরা সবাই দুলছি,
হিসেব নিকেশ পাওনা দেনা
ভুলছি রে সব ভুলছি!

ছড়াঃ ডানা মেলা ভোর - শুভ্রা ভট্টাচার্য

একদিন পাখিসব আঁটবে যে ফন্দি,
পোষ মেনে মানুষের হবে নাকো বন্দি।
লাল নীল সাদা কালো হলুদ বা গেরুয়া,
মাছ-ভাত খাবে তারা আর খাবে সুরুয়া।
দানা-মূল খাবে নাকো মোটে নয় পেয়ারা,
স্বভাব বদলে হবে সবকটা বেয়াড়া।
বার্গার মিল্কশেক আইসক্রিম মকটেল,
দানাদার জিবেগজা আর যত বিটকেল।
এইসব খাওয়াদাওয়া যত হবে অভ্যেস,
মানুষের পাখি পোষা দিনগুলি হবে শেষ।
কতদিন দামি দামি ফাস্টফুড পোষাবে?
ভাত ডাল সয়াবিন ডিম দুধ খাওয়াবে?
পাখি পোষা আসলে যে সৌখিন বদরোগ,
এসব যে পাখিদের কপালের দুর্ভোগ।
এতদিনে বোঝোনি তো, রেখেছ যে গুছিয়ে,

খাঁচায় বন্দি করে দানাপানি গছিয়ে।
দেখেছ যখন তারা চুপ করে দানা খায়?
আকাশের দিকে চেয়ে শিস দিয়ে গান গায়?
উদাস আকাশে ওড়া মুক্ত পাখির দল,
হাতছানি দিয়ে বলে ডানা মেলে উড়ে চল।
আর ধরা পড়বি নে, আর নেই ভয় তোর,
ব্যথিত মানব মনে আসবে নতুন ভোর।

অলঙ্করণঃ পুণ্ডরীক গুপ্ত

ছড়াঃ ইচ্ছেখুশির ইচ্ছে - নুরজামান শাহ্

ইচ্ছেখুশির ইচ্ছে
নুরজামান শাহ্

ইচ্ছেখুশির গাড়ি নিয়ে পাড়ি দেব কল্পে,
অচিন দেশ মাতিয়ে দেব রূপকথারই গল্পে।
থাকবে সাথে ইচ্ছেপাখি আকুল হবে প্রাণ,
সাতমুলুকে করব গিয়ে ইচ্ছেখুশির গান।
ইচ্ছে আমার রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন,
জোনাকপোকার আলো হয়ে জ্বলব সারাক্ষণ।
ইচ্ছে আমার যায় ছুটে যায় তিস্তা নদীর পারে,
গুনগুনিয়ে গান গেয়ে যায় থামায় কে আর তারে।
ইচ্ছেভরা মনটা আমার ইচ্ছেমতীর ঢেউ,
তোমরা কি ভাই আমার সাথে হারিয়ে যাবে কেউ?

অলঙ্করণঃ সুজাতা চ্যাটার্জী

ছড়াঃ মেনিয়া - উত্তীয় কোলে

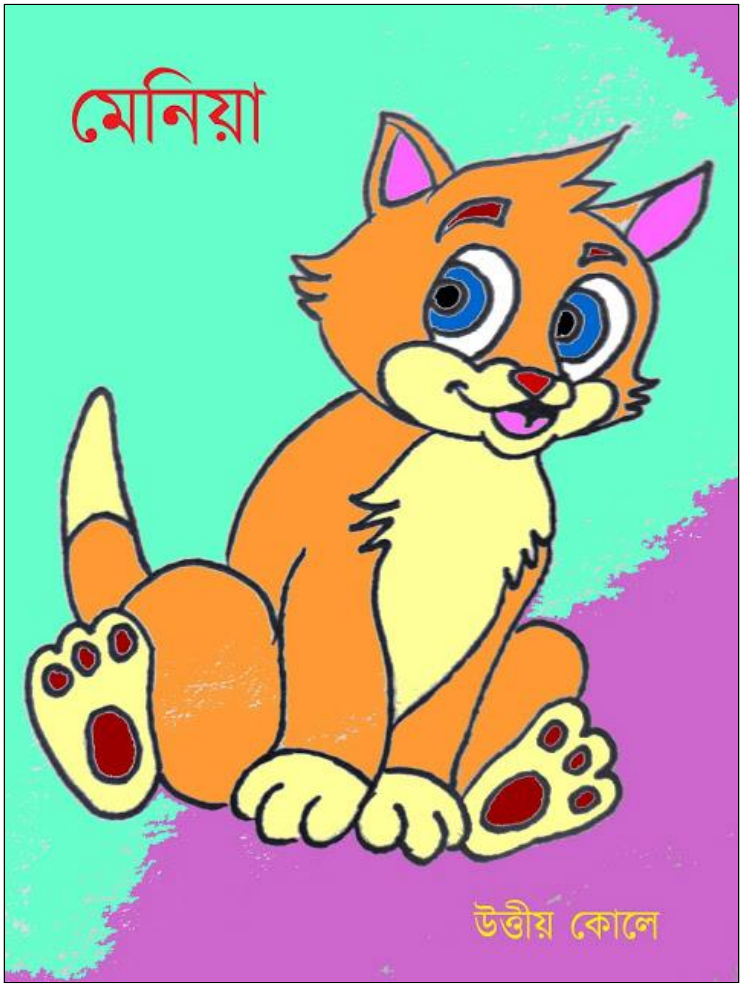

রায়বাড়ির মেনি
লাগিয়ে ঠোঁটে হানি
নাড়িয়ে লেজে চিনি
চা বানান তিনি।
বিনুনি দিয়ে গোঁফে
তোয়ালে শুকায় রোপে
কাঁচা মাছের লোভ
দিচ্ছে মনে ক্ষোভ।
উথলে গিয়ে চা
পুড়ল মেনির পা।

অলঙ্করণঃ পুণ্ডরীক গুপ্ত

চলো যাইঃ চড়িদার মুখোশ, ঝরনা আর পাখি পাহাড় - বাবিন

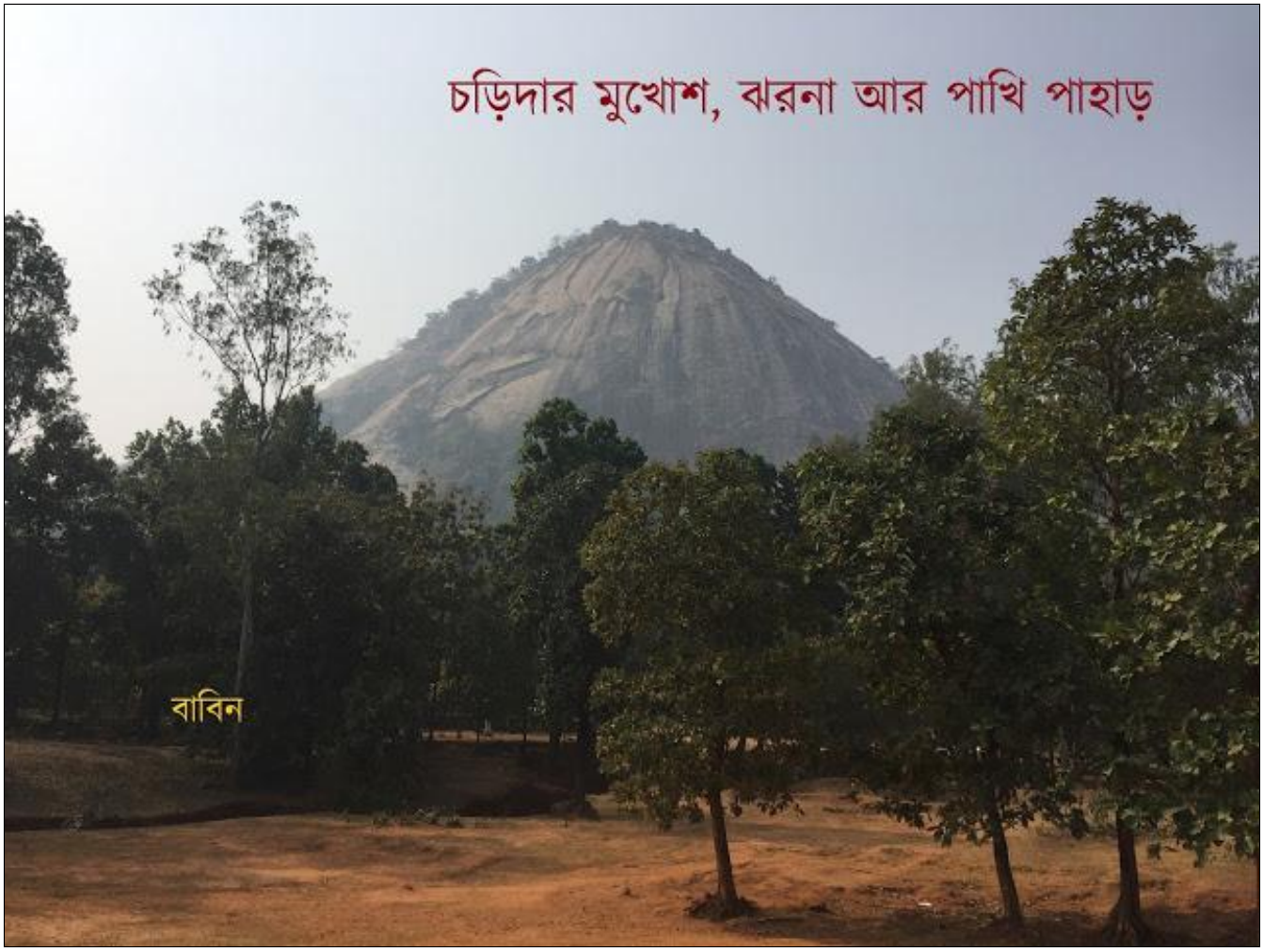

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ঠাকুরকে ডাকছিলাম। কারণ, চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে হাওড়া থেকে পুরুলিয়া পর্যন্ত ওয়েটিং লিস্ট দেখেও বুক ঠুকে অনলাইনে যে টিকিটটা কেটেছিলাম, সেটা তখনও ওয়েটিং লিস্টে এক নম্বরে রয়েছে।একজনও কি টিকিট ক্যানসেল করবেন না? তাহলেই যে আমার যাত্রা নিশ্চিত হয়ে যায়! শুনেছি অনলাইনে কাটা টিকিট কনফার্ম না হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাতিল হয়ে যায় আর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ফেরত চলে যায়। অর্থাৎ, ওই টিকিট নিয়ে যদি ট্রেনে চড়ি তাহলে বিনাটিকিটের যাত্রীর মতো সুলুক করা হবে আমার সঙ্গে!

তবে শেষমেশ সন্ধে পাঁচটা নাগাদ খবর পেলাম, টিকিট কনফার্ম হয়ে গেছে! রাত এগারোটায় ট্রেন। ধীরেসুস্থে লটবহর গুছিয়ে নিয়ে রাত ন'টা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। রাসবিহারী মোড়ে বচ্চন সিংজীর ধাবায় ঢুকে আয়েশ করে মটন কষা আর রুমালি রুটি দিয়ে ভোজনপর্ব সাঙ্গ করে রওনা দিলাম হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে।

আমার ছিল আপার বার্থ। রাতও হয়ে গেছে। তাই ট্রেনে উঠেই রেল কোম্পানির দেওয়া বিছানাপত্র পেতে একটি গল্পের বই নিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার আবার বরাবরের অভ্যাস, খাওয়া আর শোবার সময় একটি গল্পের বই চাইই চাই।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গে আমার। সাড়ে পাঁচটায় উঠে মোবাইলে একবার ম্যাপ দেখে চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারের সময়সারণীর সঙ্গে মিলিয়ে নিলাম। হিসেব মতো আমরা আদ্রার কাছাকাছি রয়েছি। ট্রেন ঠিকঠাক চলছে। বেড়াতে যাবার সময় আমি বরাবর ট্রেনের সময়সারণীর প্রিন্ট-আউট নিয়ে নিই ওয়েবসাইট থেকে। এটা খুব কাজে দেয়।

সাড়ে ছ'টায়, মোটামুটি সঠিক সময়েই পৌঁছে গেলাম পুরুলিয়া। ট্রেনেই ফ্রেশ হয়ে গিয়েছিলাম। ঝকঝকে তকতকে স্টেশনের বাইরে দেখলাম একটি সুলভ কমপ্লেক্সও রয়েছে। চটপট এক কাপ চা, দুটো বিস্কুট আর আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে সকালের সূচনা হল। চা খেতে খেতেই একটি গাড়ির মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে ফেললাম। বাপিদা (ফোন নম্বরঃ ৯৭৪৯৬৮৩৩৪৮) প্রথম সুযোগেই বলে দিল, দু'হাজার টাকায় আমাকে অযোধ্যা, বাঘমুন্ডি, পাখি পাহাড়, চড়িদা, আপার-লোয়ার ড্যাম ইত্যাদি সমস্ত ঘুরিয়ে দেখাবে। শেষমেশ দেড় হাজারে রফা হল। ওঁর বেশ কয়েকটি গাড়ি আছে। আমার সঙ্গে দিলেন মারুতি ওমনি ভ্যান আর ড্রাইভার চন্দনকে।

শহর ছেড়ে গাড়ি বাইরে বেরোতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। চতুর্দিকে সবুজের সমারোহ। কোথাও ধানের ক্ষেত তো কোথাও সবজি বাগান। মাঝে মাঝে শাল-পিয়ালের বন। এই রাস্তা সোজা চলে গেছে ঝাড়খন্ড-রাঁচি-জামশেদপুর। বেশ কিছুটা যাবার পর ডানদিকে একটা বাঁক নিল গাড়ি। তক্ষুনি নজরে পড়ল বাঁদিকে কুয়াশা ঢাকা পাহাড়। উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আমরা কি এই পাহাড়েই উঠব?"

চন্দন সায় দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমরা ওই পাহাড়েই উঠব।"

দূর থেকে

পাহাড়ে সূর্যোদয়

হাঁ করে দেখতে লাগলাম গাড়ির জানালা দিয়ে, ধূসররঙা ওই পাহাড় আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে!

বেশ খানিকক্ষণ যাবার পর আবার একটি মোড়ে এসে গাড়ি বাঁদিকে বাঁকলো। এইখানে বেশ কয়েকটি জলযোগের দোকান দেখে দাঁড়াতে বললাম।আটটা বাজে। গরম গরম লুচি আর ঘুগনি।অনেকদিন পর এরকম স্বাদ পেলাম মনে হল।পেটপুরে খেয়ে দেয়ে আবার যাত্রা শুরু হল। এবার গাড়ি পাহাড়ি পথে উঠতে শুরু করল। এঁকে বেঁকে পাহাড়ি ছোটো নদীর সেতু পার হয়ে আমরা উঠতে শুরু করলাম অযোধ্যা পাহাড়ে। বেশ কিছুটা উপরে উঠবার পর চন্দন আচমকা একটি জায়গার গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল।

"দাদা, এটা হল ভিউ পয়েন্ট," চন্দন আমাকে ইশারা করে দেখাল, "এখান থেকে নিচের একটা চমৎকার ভিউ পাবেন।"

তাকিয়ে দেখি সত্যিই তাই! নিচে পাক খেতে খেতে পাহাড়ের গায়ে গায়ে রাস্তাটা কীভাবে উপরে উঠে এসেছে এখান থেকে চমৎকার দেখা যাচ্ছে।এখানে বসে এই স্বর্গীয় দৃশ্য উপভোগ করার জন্য সরকার বাহাদুর কয়েকটি বেঞ্চি বানিয়ে রেখেছেন।কিছু সময় আমিও বসে গেলাম। চতুর্দিক জনমানবহীন। বহু নিচে কিছু আদিবাসী মহিলা গল্প করতে করতে উপরের দিকে হেঁটে হেঁটেই আসছেন। চন্দন বলল, ওরা নাকি কাঠ কুড়োতে আসছে জঙ্গলে। এখানকার স্থানীয় পুরুষরা জনমজুরের কাজ করে আর মেয়েরা জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। সেসব বিক্রি করে ওদের সংসার চলে।

অযোধ্যা পাহাড়ে ওঠার পাকদণ্ডী

আবার চড়া শুরু হল। ঘুরতে ঘুরতে আমরা পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের মাথায় — হিলটপ। এখানে এসে আমি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। আমরা আদৌ পাহাড়ে উঠেছি তো? কারণ, সবই তো সমতলভূমির মতো লাগছে। চাষের ক্ষেত, পাকা বাড়ি, হাসপাতাল সবই রয়েছে। শুধু বোর্ডে লেখা 'হিলটপ' দেখে মালুম হচ্ছে আমরা অযোধ্যা পাহাড়ের উপরেই রয়েছি। একটি চমৎকার সরকারি গেস্ট হাউস 'নীহারিকা' রয়েছে (ফোন নম্বরঃ ০৩২৫২-২২৫৭২৬)। শুনলাম ওখানে দিব্যি থাকা যায়। কেয়ারটেকারকে বললে বনমোরগের ঝোল-ভাত খেয়ে আরাম করে রাত্রিবাস করা যায়।

নীহারিকা

আমার তো তেমন পরিকল্পনা নেই, তাই এগিয়ে গেলাম রাম মন্দিরের দিকে। এই লজটির ঠিক পেছনদিকেই রয়েছে মন্দির। অযোধ্যা যাব আর রাম মন্দির যাব না তাই কি হয়? এখানে বেশ কিছু গাড়ি রয়েছে। যাঁরা নীহারিকায় থাকবেন তাঁরা এখান থেকে গাড়ি বুক করে কাছাকাছি দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখতে পারবেন।

অযোধ্যার রাম মন্দির

রাম মন্দিরের মূর্তি

রাম মন্দিরের দেওয়াল চিত্র

জটায়ু বধ

এরপর আমরা এগিয়ে গেলাম ময়ূর পাহাড়ের দিকে। এখানে পাথরের ওপর পা ফেলে ফেলে হেঁটে উঠতে হল প্রায় তিরিশ-চল্লিশ ফুট। ছোটো পাহাড়। এর মাথায় আর একটি ছোটো রাম মন্দির রয়েছে। এখান থেকে চতুর্দিকের চমৎকার একটি দৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে। এখানেও সুদৃশ্য বেঞ্চ পাতা। বেশ কিছু ছবি তুলে আবার ফিরে এলাম গাড়িতে।

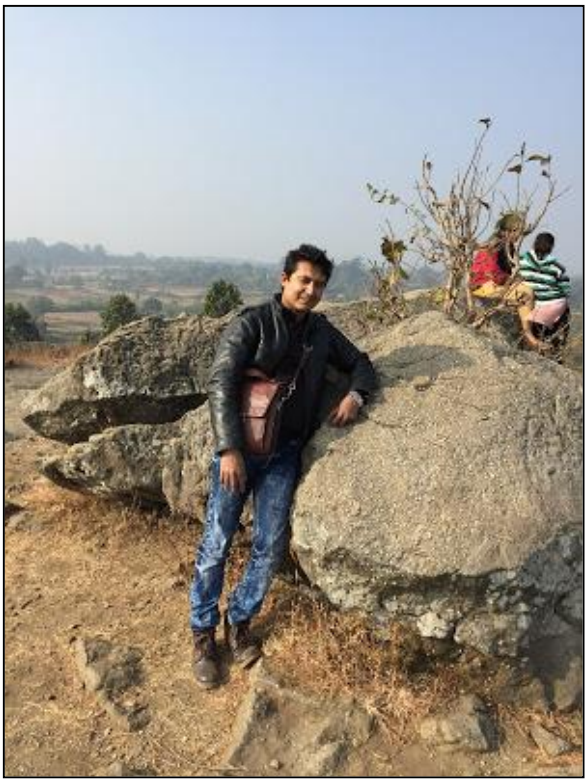

ময়ূর পাহাড়ে

ময়ূর পাহাড়ে একটু বিশ্রাম

ময়ূর পাহাড়ে রাম মন্দির

এবার আমরা আবার বেশ কিছুক্ষণ ধরে জঙ্গলের পথে ছুটতে লাগলাম। শালের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের বুকে তৈরি করা কংক্রিটের, কখনও পিচের সেই রাস্তা মাঝে মাঝেই ভিজে গেছে চুঁইয়ে আসা জলের ধারায়। কে জানে কোথা থেকে এল এই জল, আর কোথায়ই বা গেছে। আমি নীরবে সেই চিন্তাতেই মশগুল।
খানিক পরে আবার এক পাহাড়ের গায়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চন্দন বলল, “একটু সাবধানে দেখুন, এই পাহাড় কেটে কেটে পাথর নিয়ে গিয়েই তৈরি করা হয়েছে ড্যাম।”

এখান থেকেই পাথর কেটে ড্যাম বানানো হয়েছে

সত্যিই তাই! দেখি সামনে যে পাহাড়টি রয়েছে তার গা ঘেঁষে গভীর এক খাদ। দেখে মনে হচ্ছে কত সহস্র বছর ধরে না জানি এই খাদে বৃষ্টির জল জমতে জমতে এক গভীর হ্রদের সৃষ্টি করেছে। কালচে সবুজ সেই জলের দিকে তাকালে বেশ ভয়ই করে। অতলান্ত তার আহ্বান। বিপজ্জনক খাদের দিকে চেয়ে ভাবছিলাম, মানুষ কত পরিশ্রমের দ্বারা আমাদের জন্য এই সুগম পথ তৈরি করেছে!
এরপর চন্দন আমাকে নিয়ে গেল বামনি ফলসের কাছে। ঝরঝর করে একটানা শব্দ হয়ে চলেছে কোথাও এটা বুঝতে পারলেও তার উৎস বুঝতে পারলাম না। এখানে বেশ কয়েকটি খাবারের দোকান রয়েছে। চন্দন আমাকে ইশারা করল দোকানগুলির পেছনদিকে। এগিয়ে গেলাম। বেশ ছোটো একটি নালার মতো জলের স্রোত রাস্তার পাশ দিয়ে গিয়ে খাড়াভাবে বেশ কিছুটা নিচে পাথরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তারই শব্দ। পাহাড়ের গা দিয়ে পাথর কাটা রাস্তা সিঁড়ির মতো নেমে গেছে। তড়বড় করে এগিয়ে গেলাম। এমনভাবে ঝরনার গা ঘেঁষে নিচে নামার অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনও হয়নি। শিশুর মতো আনন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে থাকলাম। বেশ কিছুটা নামার পর একটা চাতালমতো জায়গা এল।এখান থেকে ঝরনাটা বেশ ভালোভাবে উপভোগ করা যাচ্ছে। আরও খানিক নিচে নামার পর ঝরনাটা তৈরি করেছে একটা বিশাল হ্রদ। বইতে পড়েছিলাম, 'বিন্দু বিন্দু জল মিলে তৈরি করে সিন্ধু' — আজ কথাটার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করলাম।ওই একটি ছোটো নালার মতো জল ঝরনা হয়ে বয়ে এসে একটি এত বড়ো হ্রদ তৈরি করেছে!

বামনি জলপ্রপাত

বামনির ছন্দে

বামনি প্রপাত

বামনির জলে এই হ্রদের সৃষ্টি

“আঙ্কল! আঙ্কল!”

আওয়াজ শুনে একটু বিস্মিত হয়েই ঘুরে তাকালাম। দেখি একটি বছর দশেকের ছোট্ট ছেলে আমার দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “কী হয়েছে?”

হিন্দিতে ছেলেটি যা বলল তার অর্থ, বাবা-মাকে ছেড়ে একলা একলা এই চড়াই বেয়ে নিচে নেমে এসেছিল সে ঝরনা দেখতে। কিন্তু এখন আর উপরে ওঠার মতো সাহস হচ্ছে না। নিচের দিকে তাকালেই ভয়ে মাথা ঘুরে যাচ্ছে। পা ফসকে পড়লেই ব্যস, দফারফা হয়ে যাবে।

আমি মৃদু হেসে তার হাতটি ধরলাম। তারপর দু’জনে গল্প করতে করতে উপরে উঠতে লাগলাম। মনে হতে লাগল, আমিও যেন ওরই মতো দশমবর্ষীয়ই হয়ে গেছি।

পাপাই, সেই ছেলেটিকে তার বাবা-মার জিম্মায় দিয়ে বিদায় জানিয়ে, ঝরনাকে নিজের মতো বইতে দিয়ে আমরা আরও অনেকটা পাড়ি দিয়ে চলে গেলাম বাঘমুন্ডি ড্যাম। এখানে দুটি ড্যাম আছে — আপার আর লোয়ার। প্রথমে পড়ল আপার ড্যাম। জাপানি প্রযুক্তি আর অর্থ সহায়তায় তৈরি এই বাঁধে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য এক বিশাল জলাধার রয়েছে। সুন্দর করে সাজানো গোছানো এবং রেলিং দিয়ে এর অনেকটা ঘেরা। এখানে পিকনিক করা নিষেধ। জলে কোনওরকম নোংরা ফেলা যাবে না।

আপার ড্যামের সামনে

আপার ড্যাম

আপার ড্যামের এই অংশে পিকনিক করা যায়

জাপানি প্রযুক্তির টারবাইন

এরপর ড্যামের ওপরের রাস্তা দিয়ে আমরা আবার নামতে শুরু করলাম পাশের পাহাড়ে। এখানে রয়েছে লোয়ার ড্যাম। শুনলাম টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় উপরের বাঁধ থেকে নিচের বাঁধে জল নামতে থাকে। পরে আবার এই নিচের জল উপরে তোলার জন্য আলাদা কলকব্জা আছে।

লোয়ার ড্যাম পেছনে

লোয়ার ড্যাম

লোয়ার ড্যামের কিছুটা অংশ

লোয়ার ড্যামের ওপর থেকে

লোয়ার ড্যামের কোলে এক চমৎকার পিকনিক স্পট গড়ে উঠেছে। অন্তত গোটা পঞ্চাশেক বাস দাঁড়িয়ে এখানে।সবাই হইহই করে রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। কাছে বেশ কয়েকটি মন্দিরও রয়েছে। ড্যামের এক প্রান্তে স্নান করার জন্য ঘাট করা আছে। এখানে আমরা কিঞ্চিত চা পান করে নিলাম।

এখানে বেশ কয়েকটি মন্দির আছে

আরেকটি মন্দির

লহরিয়া বাবার মন্দির

আরও একটি মন্দির

আবার একটি মন্দির

এখানে ঘাট করা, স্নানের জন্য

এবার আমাদের গন্তব্য চড়িদা। চড়িদা ছৌ নাচের মুখোশের জন্য বিখ্যাত। এখানে কাগজের মন্ডের উপর রং করে বাহারি মুখোশ বানানো হয়। খুবই সস্তা। মাত্র পঞ্চাশ টাকা থেকে শুরু করে আড়াই-তিন হাজারেরও মুখোশ আছে। নির্ভর করে মাপ আর কারুকার্যের সূক্ষ্মতার উপর। বাড়ির জন্য গোটা পাঁচেক মুখোশ বগলদাবা করে আবার চন্দনের গাড়িতে চেপে বসলাম।

চড়িদা

মুখোশের দোকান

নানারকম মুখোশ

মুখোশের রকমসকম

হাজারো মুখোশ

আমাদের শেষ দর্শনীয় স্থান ছিল পাখি পাহাড়। শিল্পী চিত্ত দে'র তত্ত্বাবধানে বেশ কিছু শিল্পী একটি ছোটখাটো পাহাড়কে খোদাই করে তার গায়ে নানান পাখির ছবি আঁকার কাজ করে চলেছেন সেই ১৯৯৬ সাল থেকে। অসাধারণ সেই শিল্পকর্মকে আইফোনের ক্যামেরায় বন্দী করে আর পুরুলিয়ার এই রোমাঞ্চকর স্মৃতিকে বুকে আঁকড়ে ধরে ফিরে চললাম চন্দনের গাড়িতে।

পাখি পাহাড়ের কারুকার্য

নাহ্, এই এক সফরেই পুরুলিয়া আমাকে ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধে ফেলেছে। আবার ফিরে আসতে হবে, খুব শিগগির।

———

জ্ঞানবিজ্ঞানঃ রক্তবৃষ্টি - দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

২০০১ সালের ২৫ জুলাই থেকে শুরু হয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর অবধি কেরালার নানা এলাকায় মাঝেমাঝেই লাল রঙয়ের বৃষ্টি হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি পরিমাণে এই বৃষ্টি হয়েছিল কোট্টায়াম আর ইদুক্কি জেলায়। এই বৃষ্টির জলের চেহারা অনেকটা রক্তের মতো।

কাপড়চোপড়ে লাগলে সেইরকমের দাগ ধরেছিল। বৃষ্টিটা প্রথম শুরু হবার আগে নাকি প্রচণ্ড জোরে বাজ পড়ার মতো শব্দ হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল তীব্র আলোর ঝলক। বহু গাছের থেকে ঝরে পড়েছিল পুড়ে ও কুঁকড়ে যাওয়া পাতার রাশ। হঠাৎ করেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল বেশ কিছু কুয়ো।

ব্যাপারটা নিয়ে সরকারি তদন্তও একটা হয়। তাতে বলা হল, ওই বৃষ্টির জলের নমুনাতে কোনও ধরনের উল্কারজ বা আগ্নেয়ভস্মের চিহ্ন ছিল না। ছিল না কোনও রাসায়নিকের চিহ্নও। সরকারি ব্যাখ্যাটা হল, ঘটনার আগে বেশ কয়েকদিন ধরে প্রচণ্ড বৃষ্টির ফলে ওই এলাকায় কিছু বিশেষ ধরনের লিচেনের (শৈবাল ও ছত্রাকের মাঝামাঝি একধরনের অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ) খুব বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল। তাদেরই স্পোর বা বলতে পার, বীজ বাতাসে ভেসে ভেসে মেঘের গায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। আর তাতেই রক্তের রঙ ধরেছে বৃষ্টিতে। গবেষকেরা অবশ্য কেমন করে অতদিন ধরে বৃষ্টিতে রঙ ধরাবার মতো পরিমাণে স্পোর মেঘে গিয়ে পৌঁছুল তার কোনও সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। আবার বৃষ্টিরাঙানো মাটির কিছু নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল, তাতে অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ বেশ বেশি অথচ ফসফরাসের পরিমাণ খুবই কম। আমাদের পরিচিত সমস্ত জীবকোষে কিন্তু এই দুই উপাদানের ঘনত্বের হিসেবটা ঠিক উলটো। মানে প্রথমটা তাতে থাকে অনেক কম পরিমাণে, কিন্তু পরেরটির পরিমাণ তাতে থাকে বেশি।

২০০৩ সালে কোট্টায়ামের মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বিজ্ঞানী গডফ্রে লুইস এবং এ সন্তোষ কুমার সেই বৃষ্টির জলের নমুনা পরীক্ষা করে একটা গবেষণাপত্র লিখলেন। তাতে দেখা গেল, জলের মধ্যে থাকা লাল রঞ্জক পদার্থগুলো জৈব উপাদানে ভরপুর। অথচ তাতে আগে বলা দুই মৌলের ঘনত্বের যে হিসেব তাতে পার্থিব কোনও জীবকোষের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তা মেলে না। তাহলে? আর একটা হিসেব দিলেন গডফ্রেরা। তা হল, এক লিটার জলে ওই রঞ্জক কণার পরিমাণ ১০০ মিলিগ্রাম। সেই হিসেবে মোট যত লাল বৃষ্টি ওই এলাকায় হয়েছিল তাতে মোট রঞ্জকের হিসেব দাঁড়াল ৫০ টন! এত পরিমাণ স্পোর কি বাতাসে ভেসে ওঠা সম্ভব? আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য, আরেকটা পরীক্ষায় দেখা গেল, পার্থিব জীবকোষে যে দুটো রাসায়নিকের অবশ্যম্ভাবী উপস্থিতি থাকে সেই ডিএনএ বা আরএনএ-র কোনও চিহ্ন নেই ওদের মধ্যে।

'অ্যাস্ট্রোফিজিক্স অ্যান্ড স্পেস সায়েন্স' পত্রিকায় তাঁদের প্রকাশিত গবেষণাপত্রটি বেশ সাড়া ফেলেছিল বিজ্ঞানীমহলে। তাঁরা দাবি করছেন, এগুলি পৃথিবীর বাইরের থেকে আসা জীবদেহের অংশ। পৃথিবীর আবহাওয়ায় ঢুকে আসা কোনও ছোট ধূমকেতু বা উল্কাপিণ্ডের বিস্ফোরণের ফলেই হয়তো তারা ছড়িয়ে পড়েছিল মেঘের ভেতর। সঙ্গে ওই লাল রঞ্জকের একটা কণার বিবর্ধিত ছবি দিলাম। লুইসদের দাবি, এগুলো কোনও মহাজাগতিক জীবকোষ।

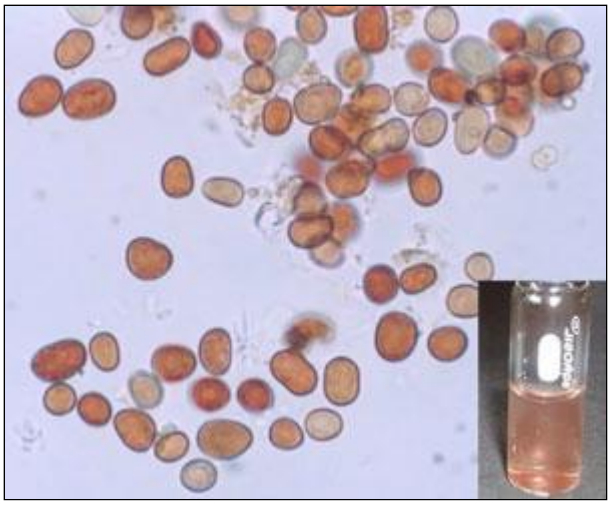

বহু গবেষণা এখনও চলছে ওই লাল বৃষ্টি নিয়ে। বিজ্ঞানী চন্দ্র ওয়াইক্রমসিঙ্ঘে দাবি করেছেন, তাঁর পরীক্ষায় ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ওদের মধ্যে ডিএনএ-র উপস্থিতির। তবে নিশ্চিত ফল এখনও পাওয়া যায়নি। চলছে তত্ত্ব ও বিপরীত তত্ত্বের লড়াইও। তবে শেষমেশ যদি লুইসদের তত্ত্বটা ধোপে টেঁকে তবে এটা হবে প্যানস্পারমিয়া তত্ত্বের (ফ্রেড হয়েল ও চন্দ্র ওয়াইক্রমসিঙ্ঘের এই তত্ত্ব বলে, মহাবিশ্বের অন্য কোথাও থেকে ধূমকেতু বা উল্কায় সওয়ার হয়েই পৃথিবীতে এসেছিল প্রথম প্রাণকণারা) প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ২০০৭-এর ২১ অগাস্ট নাকি কোঝিকোড় জেলার উত্তর অংশে আবার কোথাও কোথাও এই লাল বৃষ্টি হয়েছে। গবেষণা চলছে তার নমুনা নিয়েও।

কেরালাতে এই রক্তবৃষ্টি ফের হয়েছে ২০০৯ ও ২০১১-তে। ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীলঙ্কার তিনটে জায়গায় ফের লাল বৃষ্টি হলে সে দেশের সরকার সে দেশের পরীক্ষা করে রায় দিয়েছেন, ওতে রয়েছে লাল ও হলুদ রঙের জৈববস্তুর উপস্থিতি। রিপোর্টে আরও একটা রহস্যময় কথা বলা হয়েছে, আলোর সংস্পর্শে এলে সেগুলো নাকি বাঁচতে পারে না।

সব মিলিয়ে এই রক্তবৃষ্টি আমাদের সামনে একটা নতুন রহস্যের দুনিয়ার দরজায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তার ওপারে ঠিক কী আছে কে জানে।

ছবিঃ আন্তর্জাল

প্রবন্ধঃ আজব রীতি রেওয়াজ - কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজব রীতি-রেওয়াজ

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক দেশের রীতি-রেওয়াজের সঙ্গে আরেক দেশের রীতি-রেওয়াজ অধিকাংশ সময়েই মেলে না। দেশকাল ভেদে তা পাল্টে পাল্টে যায়। এক দেশের মানুষের কাছে যে রীতি-রেওয়াজ স্বাভাবিক অন্য দেশের মানুষের কাছে সেটাই হয়তো অদ্ভুত।

ক্যামেরনঃ আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত কারও বাড়িতে গেলে মিষ্টি বা কোনও খাদ্যবস্তু নিয়ে যাবার রেওয়াজ আমাদের মধ্যে আছে। আফ্রিকার ক্যামেরনের মানুষেরা এটা ভাবতেই পারে না। সেখানে কারও বাড়িতে কোনও খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যাওয়ার অর্থ হল সেই বাড়ির গৃহকর্ত্রী রান্না করতে জানে না। এটা বাড়ির গিন্নির কাছে অপমানসূচক বিষয়। তাই ক্যামেরনে গেলে কখনওই কারও বাড়িতে কোনও খাবার জিনিস নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এতে তাঁর সঙ্গে হয়তো সম্পর্কই ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

জাপানঃ আমাদের দেশের রীতি হল, কোনও বক্তা যখন কিছু বলে তখন শ্রোতারা শোনার সময় চোখদুটো খোলা রাখে। যদি সে চোখ বুজে থাকে তাহলে বক্তার মনে হতে পারে যে তার কথা শ্রোতা বা শ্রোতারা শুনছে না। জাপানে কিন্তু ঠিক উল্টো ব্যাপার। সেখানে শ্রোতারা যদি চোখ খোলা রাখে তাহলে বক্তা বেজায় চটে যায়। বক্তার কথা মন দিয়ে শুনছে প্রমাণ করতে গেলে শ্রোতাকে চোখ বুজে থাকতে হবে।

চিনঃ ঠান্ডা লেগে যদি সর্দি হয় আর সেই সময় যদি চিন দেশে বেড়াতে যান তাহলে সাবধান। খেতে বসে যদি হাঁচি পায় তাহলে পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকেমুখে চাপা দিয়ে হাঁচার চেষ্টা করবেন না। কারণ, এটা ওদেশের লোকেরা পছন্দ করে না। উঠে বাথরুমে চলে যাওয়াই সে দেশের রীতিনীতি। হাঁচি কমে গেলে টেবিলে ফিরে এসে আবার খেতে বসুন। উপহার দেওয়া নেওয়ার ক্ষেত্রে এ দেশের লোকেরা যত না ফুল পছন্দ করে তার চেয়ে অনেক বেশি পছন্দ করে একবাক্স চকোলেট। কেননা, মৃতের উদ্দেশ্যে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে এরা বেশি পছন্দ করে।

স্পেনঃ আমাদের দেশে খেতে খেতে গল্প করা স্বাভাবিক ব্যাপার। স্পেন দেশে এমন ঘটনা কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। সে দেশে খাবার সময় নীরবতা পালনই রীতি।

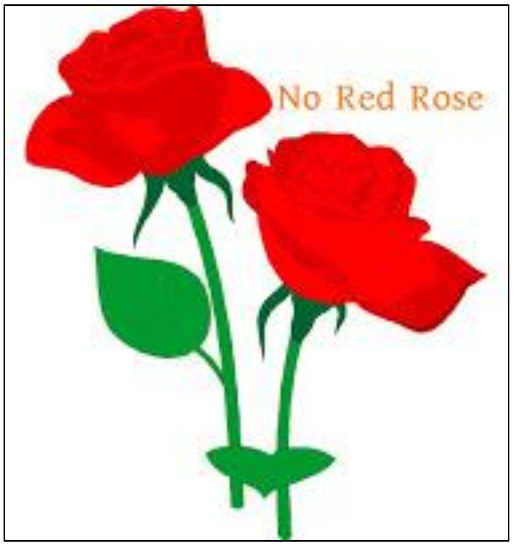

মেক্সিকোঃ মেক্সিকোবাসীদের কখনও লাল গোলাপ উপহার দিতে যাবেন না। কারণ, শুধমাত্র মৃতের সমাধিতে লাল গোলাপ দেওয়া এদেশের রীতি। অন্য রঙের গোলাপ, বিশেষ করে সাদা গোলাপ দেওয়া যেতে পারে।

আরবঃ 'দুটো কিনলে একটা ফ্রী' এমন বিজ্ঞাপন আজকাল হরদম চোখে পড়ে। বিক্রেতা ও ক্রেতাদের মধ্যে ফ্রী দেওয়া নেওয়া নিয়ে প্রায় সারাবছরই হুড়োহুড়ি লেগে থাকে। তবে কিছু না কিনলে কিন্তু আমাদের দেশে ফ্রী পাওয়া যায় না। সেটা পাওয়া যেতে পারে আরবদেশে গেলে। বেশ অদ্ভুত শোনাচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ, সে দেশে এক আজব রীতি আছে। কারও বাড়িতে অতিথি হয়ে গিয়ে সে বাড়ির সাজসজ্জা বা সুন্দর দেখতে কোনও আসবাবের প্রশংসা করলেই গৃহকর্তা সেটা অতিথিকে উপহারস্বরূপ দিয়ে দেন।

রাশিয়াঃ রাশিয়াতে শিস দিয়ে গান করাটা অমঙ্গলসূচক। সে দেশের লোকেরা মনে করে শিস দিয়ে গাওয়া গান বাতাসে ভাসতে ভাসতে যাদের বাড়িতে ঢুকবে তাদের সব সম্পদ হারিয়ে যাবে। তাই সে দেশের কেউই শিস দিয়ে গান করে না। এদেশে আরও একটা আজব রীতি আছে। এখানে কেউ কাউকে ছুরি উপহার দেয় না। এই ধরনের উপহার দেওয়ার অর্থ দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক শেষ।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, দেশে দেশে নানা সংস্কার একবিংশ শতাব্দীতেও বিদ্যমান।

ছবিঃ আন্তর্জাল

জোকসঃ প্রকল্প ভট্টাচার্য

- শোন, বৃষ্টিটা একটু ধরলে বেরোস।
- ধরলে! বৃষ্টি আবার কাকে ধরবে!
- আহা, ধরলে মানে কমলে। সবকথায় এত ভুল ধরবার কী আছে?
- ধরবার, মানে কমাবার?
- না রে বাবা! উফ, মাথা ধরিয়ে ছাড়ল।
- মাথা কমিয়ে?
- ধুত্তেরি! বলছি, এখন বেরোস না, মাঝখান থেকে ভিজে যাবি।
- মাঝখান থেকে! কেন, ওপর-নীচ ভিজবে না?
- হ্যাঁ ভিজবে, গোটাটাই ভিজবে। আমার ঘাট হয়েছে তোকে বলা।
- ঘাট? নদীর ধার?
- না, শ্মশানঘাট। যেখানে আমি যাব এখন। তোর হাতে পায়ে ধরছি, এবার চুপ কর!
- আমার হাত পা কমাচ্ছ?

- PDF এর পুরো নামটা কী বল তো?
- দাঁড়া চেষ্টা করি। কিছু একটা ফর্ম্যাট তো?
- প্রায় ধরে ফেলেছিস!
- ওহ্-হো, তাই! আমি ভাবলাম এফটা বোধহয় ফর্ম্যাট।

- তুই কোনও কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় পাশ করছিস না কেন বল তো?
- কী করে পাশ করব বাবা, ওটা জেনেটিক ব্যাপার।
- তার মানে! বলতে চাইছিস যে আমার ছেলে বলেই তুই পাশ করতে পারছিস না?
- না না, তা বলিনি। আসলে না জেনে টিক দিলে উত্তর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী হয়, এই আর কি।

প্রকল্প ভট্টাচার্য

কী আশ্চর্য!

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>ঝিঁঝিঁপোকার কান থাকে তাদের হাঁটুতে।</td><td>জলহস্তীর দুধের রঙ গোলাপি হয়।</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>মেরু ভল্লুকরা সবাই বাঁহাতি হয়।</td><td>রেজারেকশন ফার্ন ১০০ বছর শুকিয়ে থাকার পরও একটু জল পেলে আবার বেঁচে উঠতে পারে।</td></tr>
</table>

প্রজাপতি পায়ের ডগা দিয়ে খাবারের স্বাদ নেয়।	শামুকরা অভুক্ত থেকে টানা তিন বছর ঘুমিয়ে থাকতে পারে।
খাবার হজম করতে স্লথদের এক মাসেরও বেশি সময় লাগে।	একজন মানুষ বছরে প্রায় ১৪৬০টি স্বপ্ন দেখে।
একমাত্র হামিংবার্ডই পেছনদিকে উড়তে পারে।	শুধু লোমগুলোই নয়, বাঘের গায়ের চামড়াও ডোরাকাটা হয়।